একক ২ ❑ বামপন্থার উত্থান ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম

গঠন ঃ

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ কংগ্রেস ও বামপন্থীরা ঃ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

২.৩ কংগ্রেস ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি

২.৪ প্রজামণ্ডল আন্দোলন

২.৫ মুসলিম লিগ ও পাকিস্তান আন্দোলন

২.৬ সূত্র-নির্দেশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য ভারতের রাজনীতিতে বামপন্থার উত্থানের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা কংগ্রেসের সঙ্গে, নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সম্পর্ককে উপস্থাপিত করা এবং মুসলিম লিগের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে ব্যাখ্যা করা, যা শেষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়মের জন্ম দিয়েছিল।

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককে কংগ্রেস ও বাম রাজনীতি, কংগ্রেস ও গণ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ও পাকিস্তান গঠনের দাবি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২ কংগ্রেস ও বামপন্থীরা ঃ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি

১৯২০-র দশকের শেষে ও ১৯৩০-র দশকের প্রথম দিকে ভারতে এক শক্তি(শালী বামপন্থী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে, যার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি আরও স্পষ্ট ও তী(্ণ হয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় সংগ্রামের ধারা এবং নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি(র জন্য সংগ্রামের দ্বারা ক্র(মশ মিলে যেতে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ভারতের মাটিতে শিকড় গড়তে থাকে। ভারতের যুবসমাজ সমাজতন্ত্রকে তাদের মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, যাদের আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবে দেখা দেন জহরলাল নেহ(ও সুভাষচন্দ্র বসু। ত্র(মে দুটি শক্তি(শালী বামপন্থী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে—ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি।

এ সবেরই প্রেরণা ছিল (শ বিপ-ব। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কম্যুনিস্ট) পার্টি জারের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটায় এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সরকার একতরফাভাবে চিন ও এশিয়ার অন্যান্য অংশে তার সাম্রাজ্যবাদী অধিকার ছেড়ে দিয়ে উপনিবেশিক বি(েকে চমকে দেয়। এর থেকে আরও একটি শি(া উঠে আসে ঃ শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের দিয়ে সাধারণ মানুষেরা যদি শক্তি(শালী জারকে (মতাচ্যুত করে শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে ভারতের মানুষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারে। এশিয়ার মানুষ হঠাৎই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ, বিশেষত মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। ১৯১৯ সালে বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পাল লেখেন ঃ ''আজ জার্মান সামরিক শক্তি(র পতন ও জারের স্বৈরাচারী শক্তি(র ধ্বংসের পর বি(ে জুড়ে এক নতুন শক্তি(মাথা চাড়া দিয়েছে। এই শক্তি(হল তাদের ন্যায্য অধিকারগুলি ফিরে পেতে দৃঢ় সংকল্প সাধারণ মানুষের শক্তি(— যে অধিকার তথাকথিত উচ্চ শ্রেণির শোষণের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে, আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার।'' সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে কারণ অসহযোগ আন্দোলনে সত্রি(য়ভাবে অংশ নেওয়া বহু যুবক এর পরিণাম ল(করে হতাশ হয় এবং গান্ধিবাদ ও বিকল্প স্বরাজবাদী আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারায়। সারা দেশ জুড়ে অনেকগুলি কম্যুনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গঠিত হয়। বোম্বাইতে এস এ ডাঙ্গে 'গান্ধি এবং লেনিন' শীর্ষক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সূচনা করেন,যার নাম হয় 'দি সোশ্যালিস্ট।' বাংলায় মুজফ্ফর আহমেদ 'নবযুগ' প্রকাশ করেন ও পরে কবি কাজী নজ(ল ইসলামের সহযোগিতায় 'লাঙল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবে গুলাম হোসেন ও অন্যান্যরা 'ইনকিলাব' প্রকাশ করেন এবং মাদ্রাজে এম সিঙ্গারাভেলু 'লেবার-কিসান গেজেট' চালু করেন।

১৯২৭ সাল থেকে দেশ জুড়ে ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে উঠতে শু(করে। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে সারা ভারত জুড়ে শয়ে শয়ে যুব অধিবেশন আয়োজিত হয়, সেখানে বক্ত(োরা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য চরম ব্যবস্থা নেবার আহ্বান জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে জহরলাল নেহ(ও সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও জমিদারতন্ত্রকে তী(ভাষায় আত্র(মণ করেন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯২০-র দশক জুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনগুলি দ্রুত শক্তি(শালী হয়ে ওঠে। ১৯৩০-র দশকে বি(েব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ার অসামাজিক ধারণাগুলি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী বি(ের সর্বত্র বেকারির মাত্রা তুঙ্গে ওঠে। এই মন্দার ফলে পুঁজিবাদী ধারণাগুলি আত্র(মণের মুখে পড়ে এবং মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের দিকে মানুষ মনোযোগ দিতে শু(করে। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে জহরলাল নেহ(এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী প্রবণতার প্রতিফলন ঘটে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠনের মধ্যেও ওই একই প্রবণতার প্রমাণ মেলে।

মূলত জহরলাল নেহ(-ই জাতীয় আন্দোলনে এক সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নের জন্ম দেন এবং ১৯২৯ সালের পর ভারতে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতীক হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা শুধু এক রাজনৈতিক বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্য-সামাজিক বিষয়গুলিও—এই ধারণার সঙ্গে নেহ(র নাম যুক্ত(হয়ে পড়ে।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে নেহ(১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনের সভাপতি হন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে তিনি এই পদে আবার নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের সভাপতি ও গান্ধিজির পর জাতীয় আন্দোলনের সব

থেকে জনপ্রিয় নেতা হিসাবে নেহ(দেশ জুড়ে হাজার হাজার মাইল ঘুরে ল(ল(মানুষের সামনে বারবার নিজের বক্ত(ব্য রাখেন। তাঁর রচিত পুস্তক, নিবন্ধ ও ভাষণে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করে নেহ(বলেন যে, স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়ে উঠে যখন যদি তা সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনৈতিক মুক্তি(নিয়ে আসে। কাজেই স্বাধীনতার পরেই প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে ত(ণ জাতীয়তাবাদীদের এক সম্পূর্ণ প্রজন্মকে নেহ(সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত করান এবং তাদের এই ধাঁচে গড়ে তোলেন।

১৯২০-২১ সালে উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তে কৃষক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে নেহ(অর্থনৈতিক প্র(গুলির প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। এরপর ১৯২২-২৩ সালে বন্দিদশার অবসরে তিনি (শ ও অন্যান্য বিপ-ব সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক আর্ন্তাতিক অধিবেশনে যোগদান করেন এবং বি(ের বহু কম্যুনিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি মার্কসবাদের ধারণাগুলিতে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেন। ওই একই বছরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন ও সেখানকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে প্রভাবিত হন। ফিরে এসে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এক গ্রন্থ রচনা করেন—তখন তিনি একজন সচেতন বিপ-বী চিন্তাধারা সম্পন্ন মানুষ।

১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেহ('ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর্ ইন্ডিয়া লিগ' গঠন করেন, যার ল(্য হল 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করা।'' ১৯২৯ সালে 'কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নেহ(ঘোষণা করেন ঃ ''আমি একজন সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী। আমি কোনও রাজা বা রাজপুত্রে বি(্বাস করি না। আমি এমন কোনও ব্যবস্থাতেও বি(্বাস করি না যা শিল্প (ে ত্রে আধুনিক রাজাদের জন্ম দেয়, যে রাজারা সাধারণ মানুষদের জীবন ও ভাগ্যকে অতীতের রাজাদের থেকেও বেশি নিয়ন্ত্রণ করেন ও যাদের পদ্ধতি পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির থেকে আদৌ কম লুণ্ঠনাত্মক নয়।'' ''দারিদ্র্য ও অসাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে হলে'' ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ''সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা'' গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই—এটাই ছিল তাঁর বক্ত(ব্য। পুঁজি ও শ্রম, জমিদার ও প্রজা— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য র(া করার জন্য কংগ্রেসকে তেমন কোনও চাপের সম্মুখীন হয়নি, কারণ সেই সময়ে এই ভারসাম্য ভীষণ মারাত্মকভাবে পুঁজিবাদী ও জমিদারদের অনুকূলে ঝুঁকে ছিল।

তিনি এক নিয়ন্ত্রিত অর্থে ব্যক্তি(সম্পত্তি বিলোপের প(পাতী ছিলেন। তিনি তখনকার মুনাফা ব্যবস্থার পরিবর্তে সমবায়ের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করার সমর্থক ছিলেন। এই সময়ে নেহ(শ্রেণি বি(ে-ষণ ও শ্রেণি সংগ্রামের ভুমিকার উপরেও গু(ত্ব আরোপ করেন।

এই পর্যায়ে গান্ধিজির সঙ্গে নেহ(র সম্পর্ক কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে। শ্রেণি বিরোধকে অস্বীকার করার জন্য, শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যে সমন্বয়ের ডাক দেবার জন্য এবং পুঁজিবাদী ও জমিদার শ্রেণির রূপান্তরের মাধ্যমে ন্যাসর(কত্ত্বের (trusteeship) তত্ত্ব উপস্থাপনা করার জন্য নেহ(গান্ধিজির সমালোচনা করেন। প্রকৃতপ(ে তাঁর আত্মজীবনীর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় তিনি গান্ধিবাদী মতাদর্শের কয়েকটি মৌলিক দিকের মৃদু সমালোচনার জন্য উৎসর্গ করেন। একই সঙ্গে ভারতীয় সমাজে গান্ধিজি যে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তখনও নিচ্ছিলেন—সেই ভূমিকার তিনি প্রশংসা করেন। বামপন্থী সমালোচনার বি(দ্ধে গান্ধিজিকে সমর্থন করে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে নেহ(বলেন, ''গান্ধি ভারতে এক গু(ত্বপূর্ণ বৈপ-বিক ভূমিকা পালন করেছেন কারণ তিনি জানতেন কীভাবে বাস্তব অবস্থানকে কাজে লাগাতে হয় এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছোতে হয়। অন্যদিকে, আরও উন্নত মতাদর্শ অনুসরণকারী গোষ্ঠীগুলি যেন গজদন্তমিনারে বসে কাজ করে।'' এ ছাড়া, গান্ধিজির কাজ ও শি(া ''অবধারিতভাবে জনচেতনা বৃদ্ধি করেছে ও সামাজিক বিষয়গুলিকে গু(ত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কায়েমি স্বার্থকে

পরিত্যাগ করে যে কোনও মূল্যে সাধারণ মানুষের উন্নতিসাধনে তাঁর সংকল্প জাতীয় আন্দোলনকে তীব্রভাবে জনমুখী করে তুলেছে।''

কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহ(র আনুগত্য ছিল এমন এক কাঠামোর মধ্যে, বিদেশি শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত যা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকেই প্রধান মনে করত। বাস্তবে যা কর্তব্য হয়ে উঠেছিল, তা হল দ্বিতীয়টির গু(ত্ব হ্রাস না করে দুটিকে একত্রে আনা। এই কারণে ১৯৩৬ সালে সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রে প্রতিফলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা— এই দুটিই তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই দুটি দৃষ্টিকোণের সমন্বয় ঘটিয়ে এক সুসম্পূর্ণ ধারণা গঠন করার দায়িত্ব ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদের।

কাজেই নেহ(কংগ্রেস পৃথক কোনও সংগঠন গড়া বা গান্ধিজি ও দ(িণপন্থী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার কথা চিন্তা করেননি। তাঁর ল(্য ছিল কংগ্রেসকে এক সমাজতন্ত্রী পথে চালনা করা এবং এটা করা সম্ভব ছিল কংগ্রেসেরই পতাকার নীচে কাজ করে সংগঠনের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের বৃহত্তর ভূমিকা অর্পণ করা। তিনি এ কথাও মনে করতেন যে, জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সরে গিয়ে বামপন্থীরা যেন কোনও সম্প্রদায়ে পরিণত না হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বিপ্-বী আনুগত্যের আকর্ষণে বহু ভারতীয় বিপ্-বী ও বিদেশে বসবাসকারী দেশছাড়া ভারতীয় সেখানে গিয়ে পৌঁছোন। এদের মধ্যে সব থেকে পরিচালিত হলেন এম এন রায়, যিনি লেনিনের সঙ্গে কাজ করে উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতি প্রণয়নে সহায়তা করেন। রায়ের নেতৃত্বে এই রকম সাতজন ভারতীয় ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে তাসখন্দে মিলিত হন এবং 'কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' বা 'ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি' গঠন করেন। এই প্রয়াস ছাড়াও আমরা যা ল(্য করেছি, ১৯২০ সালের পর ভারতে বেশ কয়েকটি বামপন্থী ও কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী ও সংগঠনের জন্ম হয়। গোষ্ঠীগুলির বেশির ভাগই ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে মিলিত হয় এবং কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি নামে এক সর্বভারতীয় দলের জন্ম দেয়। কিছু দিন পর এস ভি ঘাটে দলের সাধারণ সচিবের পদ গ্রহণ করেন। এই দল তার প্রতিটি সদস্যকে কংগ্রেসের সভা হিসাবে নাম লেখানোর নির্দেশ দেয়, কংগ্রেসের প্রতিটি শাখায় শক্তি(শালী বামপন্থী গোষ্ঠী গঠন করতে বলে এবং চরমপন্থী অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্যদের কংগ্রেসকে এক জনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেয়।

প্রথম দিকে কম্যুনিস্টদের প্রধান রাজনৈতিক কাজ ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের দলগুলি সংগঠিত করা ও তাদের মাধ্যমে কাজ করা। এই ধরনের প্রথম সংগঠনটি হল মুজফ্ফর আহমেদ, কাজী নজ(ল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার ও অন্যান্যদের দ্বারা সংগঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'লেবার-স্বরাজ পার্টি' যা গঠিত হয় বাংলায় ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯২৬ সালের শেষ দিকে বোম্বাইতে কংগ্রেস লেবার পার্টি ও পাঞ্জাবে কীর্তি কিষান পার্টি গঠিত হয়। ১৯২৩ সাল থেকে মাদ্রাজে লেবার কিষান পার্টি নামে এক দল ইতিমধ্যেই কাজ শু(করেছিল। ১৯২৮ সালের মধ্যে এই প্রাদেশিক সংগঠনগুলির প্রত্যেকটিকে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজস্টিস পার্টি' নামে দেওয়া হয় এবং এদের একত্রিত করে একটি সর্ব ভারতীয় দল গঠন করা হয়। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতেও এই দলের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কম্যুনিস্টরা সকলেই এই দলের সদস্য হয়। ডব্লু. পি. পি.-র মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাজ করে একে এক 'জনগনের দলে' পরিণত করা এবং স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণি সংগঠন গড়ে তোলা যাতে প্রথমে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও শেষে সমাজতন্ত্র আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। ডব্লু. পি. পি. দ্রুত শক্তি(সঞ্চয় করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষত বোম্বাইতে কংগ্রেসের ভিতর কম্যুনিস্ট প্রভাব দ্রুত বেড়ে ওঠে। এছাড়া, জহরলাল নেহ(ও অন্যান্য পরিবর্তনকামী নেতারা ডব্লু. পি. পি.-র এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। নেহ(, সুভাষচন্দ্র

যুব লীগ ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তি(গুলির সাথে সাথে ডব্লু.পি.পি. কংগ্রেসের ভিতর এক শক্তি(শালী বামপন্থী অংশ গড়ে তুলতে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বাম-মুখী করে তোলে। ট্রেড ইউনিয়নের (ে ত্রেও ডব্লু. পি. পি. দ্রুত সাফল্য অর্জন করে এবং ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের পুন(জ্জীবন ঘটাতে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। এর ফলে কম্যুনিস্টরা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নিজেদের অবস্থানকে শক্তি(শালী করে তুলতে সফল হয়।

১৯২৯ সালে ও তার পরে অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের উপর কম্যুনিস্টদের এবং ডব্লু.পি.পি.-র প্রভাব ত্র(মশ কমে আসে ও শেষে মুছে যায়। এর পেছনে দুটি কারণ কাজ করে। প্রথমত, সরকার কম্যুনিস্টদের কড়া হাতে দমন করতে আরম্ভ করে। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যেই যে সব কম্যুনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন, তাদের বি(দ্ধে পেশোয়ারে ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়।' এই দমননীতির চাপে পড়ে কম্যুনিস্টরা অহিংস আন্দোলনের প্রকৃত রূপ 'উন্মোচন' করার কাজে নেমে পড়ে ও সাম্রাজ্যবাদের বি(দ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের স্লোগান দেয়। ১৯৩২ সালে গান্ধি-আরউইন চুক্তি(কে তারা জাতীয়তাবাদের প্রতি কংগ্রেসের বি(্বাসঘাতকতার প্রমাণ বলে বর্ণনা করে।

শেষে ডব্লু. পি.পি.-কেও ভেঙে দেওয়া হয় এই যুক্তি(তে যে, দ্বি-শ্রেণি (শ্রমিক ও কৃষক) দল গঠন করা যুক্তি(যুক্ত(নয় কারণ তাহলে এই দল সহজেই পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কম্যুনিস্টরা বরং এক বেআইনী, স্বাধীন ও কেন্দ্রীভূত কম্যুনিস্ট দল গঠন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অবস্থানের এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে কম্যুনিস্টরা এমন এক সময়ে জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যখন সারা দেশ তার বৃহত্তম গণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং মানুষের উপর বামপন্থীর প্রভাব বৃদ্ধি করার (ে ত্র অত্যন্ত উর্বর। এ ছাড়া, কম্যুনিস্টরা সেই সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সরকার এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেয় এবং ১৯৩৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়াকে বেআইনি ঘোষণা করে।

এরপরও কিন্তু কম্যুনিস্ট আন্দোলন চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে র(া পায়। কারণ, বহু কম্যুনিস্ট তখনও অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে যেতে অস্বীকার করে তাতে সক্রি(য়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট ধ্যান ধারণাগুলি দেশ জুড়ে তখনও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে বহু ত(ণ, যারা অসহযোগ আন্দোলন বা বিপ্-বী সংঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত(ছিল, তারা সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে আকর্ষিত হয় এবং ১৯৩৪ সালের পরে সি.পি.আই.-তে যোগদান করে।

১৯৩৫ সালে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যখন পি.সি. যোশীর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি পুনঃসংগঠিত হয়। ফ্যাসিবাদের বিপদের মুখে পড়ে ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শক্তি(ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জেয়া নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত(মোর্চা গঠনের প্রস্তাব দেয়। এর ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টরা আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে অংশ নেয়। ভারতে কম্যুনিস্ট রাজনীতির পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত এক নথির মাধ্যমে যা সচরাচর 'দত্ত-ব্রাডলে থিসিস' নামে পরিচিত। এই ভাবনা বা 'থিসিস' অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জন মোর্চ গঠনের (ে ত্রে জাতীয় কংগ্রেসের এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার (মতা আছে। ১৯২৪ সালে সদ্যোজাত কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে পঙ্গু করে দেবার উদ্দেশ্যে সরকার কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ, নলিনী গুপ্ত এবং সউকত উসমানীর বিচার চালায়। এই মামলাতে চারজনকেই চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯২৯ সালের মধ্যেই জাতীয় ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর কম্যুনিস্টদের দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধি সরকারের

উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। তখন একে তারা শক্ত(হাতে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নেয়। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ হানা দিয়ে পুলিশ বত্রিশজন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে তিনজন, অর্থাৎ ফিলিপ স্প্রাট, বেন ব্র্যাডলে ও লেস্টার হাচিনসন ছিলেন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট, যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। সরকারের মূল ল(্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। সরকারের মূল ল(্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নেতৃহীন করা ও জাতীয় আন্দোলন থেকে কম্যুনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা। ধৃত বত্রিশজনকে বিচারের জন্য মীরাটে আনা হয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শীঘ্রই লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। জহরলাল নেহ(, এম এ আনসারি, এম সি চাগলার মত বহু জাতীয়তাবাদী বন্দিদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করতে গান্ধিজি বন্দিশালায় তাঁদের সঙ্গে সা(াৎ করেন। নিজেদের সমর্থনে আদালতে বন্দিরা যে বক্ত(ব্য রাখেন, তা দেশের সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করে। এর ফলে ল(ল(মানুষ এই প্রথম কম্যুনিস্ট ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে কম্যুনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করার সকারি পরিকল্পনা শুধু ব্যর্থই হয় না, বরং তার ফল একেবারে বিপরীত হয়। অবশ্য একটি (ে ত্রে এই পরিকল্পনা সফল হয়। ত্র(মশ শক্তি(শালী হয়ে উঠতে থাকা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। ওই পর্যায়ে তাঁদের স্থানে নতুন নেতৃত্বকে বসানো সহজ ছিল না।

যেন এই সরকারি আঘাতই যথেষ্ট নয়—কম্যুনিস্টরা হঠাৎ 'বামপন্থী বিচ্যুতি' বা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির দিকে সরে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মারাত্মক (তি করে।

কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কংগ্রেসকে বুর্জোয়া শ্রেণির দল বলে অভিহিত করে। এছাড়াও, কংগ্রেস এবং সে যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে, অর্থাৎ সেই বুর্জোয়া শ্রেণিকে সাম্রাজ্যবাদের পষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করে। পূর্ণ স্বরাজের ল(্য কংগ্রেসের গণ আন্দোলনের পরিকল্পনাকে তারা ভাঁওতা বলে অভিহিত করে এবং একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের শ্রমিক শ্রেণির উপর প্রভাব খাটানোর এক প্রচেষ্টা বলে সমালোচনা করে। নেহ(এবং বসুর মত কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারাও 'বুর্জোয়ার দালাল' বলে অভিহিত হন।

কম্যুনিস্ট পার্টি এখন তার সদস্যদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বলে এবং তার প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে কংগ্রেসে নাম লেখাতে বলে। ১৯৩৮ সালে আরও এক ধাপ এগিয়ে তারা কংগ্রেসকে 'ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রধান কেন্দ্রীয় সংগঠন' হিসাবে স্বীকার করে। ১৯৩৯ সালে দলীয় সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে' পি. সি. যোশী লেখেন যে 'আজকের সব থেকে বড় শ্রেণী সংগ্রাম হল আমাদের জাতীয় সংগ্রাম', কংগ্রেস হল যার 'প্রধান অঙ্গ'। একই সঙ্গে তারা জাতীয় সংগ্রামকে শ্রমিক শ্রেণি, অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বাধীন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কম্যুনিস্টরা তখন কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। অনেকে কংগ্রেসের জেলা ও প্রাদেশিক কমিটিতে বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে— প্রায় কুড়ি জন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদে অভিষিক্ত(হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তারা কেরালা, অন্ধ্র, বাংলা ও পাঞ্জাবে শক্তি(শালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে। সব থেকে বড় কথা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সব থেকে বেশি জঙ্গি গোষ্ঠী হিসাবে তারা ফের মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

গান্ধিবাদী কৌশল ও নেতৃত্বে হতাশ হয়ে কিছু সমাজতন্ত্র অনুরাগী কংগ্রেসী ত(ণ ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩২-৩৪

সালের মধ্যে বন্দিশালায় থাকার সময় এক সমাজতন্ত্রী দল গঠনের পরিকল্পনা করে। তাদের অনেকেই ১৯২০-র দশকের যুব আন্দোলনে সক্রি(য় অংশ নিয়েছিল। বন্দিশালায় তারা মার্কসবাদ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা ও আলোচনা করে। মার্কসবাদ, কম্যুনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে তারা সিপিআই-এর তৎকালীন রাজনৈতিক পথের বিরোধিতা করে। তাদের অনেকেই এক বিকল্পের খোঁজ করতে থাকে। শেষে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব ও মিনু মাসানীর নেতৃত্বে তারা একত্রিত হয় এবং ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করে। শু(থেকেই কংগ্রেসি সমাজতন্ত্রীরা চারটি মৌলিক বিষয়ে একমত হয় ঃ (১) ভারতে প্রধান সংগ্রাম হল স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের পথে জাতীয়তাবাদ এক প্রয়োজনীয় পদ(ে প, (২) জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই সমাজতন্ত্রীদের কাজ করা উচিত কারণ কংগ্রেসই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে ও আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের মতে, এই অবস্থায় কংগ্রেসের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে তা আত্মহত্যার সামিল হবে', (৩) কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করতে হবে, এবং (৪) এই ল(্য পূরণ করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালাতে হবে ও তাদের জাতীয় সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত করতে হবে।

শু(থেকেই সি.এস.পি. নিজেকে কংগ্রেসের রূপান্তর ও শক্তি(বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করে। কংগ্রেসের রূপান্তরের কাজটির দুটি দিক ছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল মতাদর্শগত দিক। কংগ্রেস কর্মীদের ব্র(মশ বোঝাতে হবে যে স্বাধীন ভারতে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং বর্তমান অর্থনৈতিক বিষয়গুলির (ে ত্রে আরও শক্তি(শালী শ্রমিক ও কৃষকপন্থী নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই মতাদর্শগত ও কর্মসূচিগত রূপান্তরকে অবশ্য এক ঘটনা নয়, বরং এক প্রক্রি(য়া হিসাবে দেখা হয়।

সাংগঠনিক, অর্থাৎ নেতৃত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমেও কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটানোর কথা ভাবা হয়। প্রথমে তৎকালীন নেতৃত্বকে অপসারিত করার কথা চিন্তা করা হয়, কারণ সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দিতে তাদের (মতা সন্দেহাতীত ছিল না। সিএসপি কংগ্রেসের মধ্যে এক বিকল্প সমাজতন্ত্রী নেতৃত্ব গঠনের ল(্য কাজ করতে চায়।

এই দৃষ্টিকোণ অবশ্য শীঘ্রই অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয় এবং এর পরিবর্তে এক 'মিশ্র' নেতৃত্বের কথা ভাবা হয় যেখানে নেতৃত্বের সব স্তরে সমাজতন্ত্রীরা অর্ন্তভুক্ত(হবেন। কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের এক বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব গঠনের ধারাটি ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী ও ১৯৪০ সালে রামগড়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরিণামে বাম-দ(িণ ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিভাজিত হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিলে সি.এস.পি. (এবং সি.পি.আই) এই অবস্থান থেকে সরে আসে। সি.এস.পি. (এবং সি.পি.আই) নেতৃত্ব উপলব্ধি করে যে এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধু জাতীয় আন্দোলনকেই দুর্বল করে তুলবে না, বামপন্থীদেরও মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তারা বুঝতে পারেন যে একমাত্র গান্ধিজির নেতৃত্বেই ভারতের জনগণকে এক সমবেত আন্দোলনের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য জহরলাল নেহ(র মত সি.এস.পি.-র নেতৃবৃন্দ এই উপলব্ধিকে এক পূর্ণ তাত্ত্বিক রূপ দিতে স(ম হন এবং এর ফলে তাঁরা বারবার বিকল্প নেতৃত্বের প্রশ্নেটিতে ফিরে যান।

ভারতের পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সি.এস.পি. অবশ্য যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন ছিল। এই কারণে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধকে সম্পর্ক ছিন্ন করার স্তরে নিয়ে যায়নি। কোনও চরম মুহূর্ত এসে পড়লে সি.এস.পি. তার তাত্ত্বিক অবস্থান ত্যাগ করে জহরলাল নেহ(র মতের কাছাকাছি কোনও বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত। এর ফলে সি.এস.পি. অন্যান্য বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলির সমালোচনার সম্মুখীন হত। যেমন, ১৯৩৯

সালে গান্ধিজির সঙ্গে মোকাবিলায় সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করতে অস্বীকার করায় তারা আত্র(মণের মুখোমুখি হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করত এবং ভারতের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি প্রমাণ পাওয়া যেত।

শু(থেকেই সি.এস.পি. মোটামুটিভাবে তিনটি মতাদর্শে বিভক্ত(ছিল ঃ মার্কসীয়, ফেবিয়ান (Fabian) ও গান্ধিবাদী। দুর্বলতা দূরে থাক, এটা যে কোনও সমাজতন্ত্রী দল, বিশেষত আন্দোলনের এক শক্তি(হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সি.এস.পি. ইতিমধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস নামে এক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত(এক ক্যাডার-ভিত্তিক দলে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া, ১৯৩০-র দশকের মার্কসবাদের প(বামপন্থার এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্রোতকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এর ফলে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল যা সি.এস.পি.-কে শেষ অবধি বিব্রত করেছিল। দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ব্যক্তি(গত মিত্রতা তার অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত বিভেদগুলিকে দীর্ঘদিন ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিল।

মতাদর্শগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সি.এস.পি. মোটামুটিভাবে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের এক মৌলিক সাদৃশ্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ত্র(মশ গান্ধিবাদী রাজনীতির ইতিবাচক মূল্যায়ন হতে থাকলে, দলের নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাপে গান্ধিবাদ ও উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়তে থাকল।

১৯৩০-র দশকে আরও বেশ কিছু বামপন্থী চিন্তাধারা ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ১৯৩০ সালে এম. এ. রায় ভারতে ফিরে আসেন এবং বামপন্থী বা তাঁর মতাদর্শের অনুগামীদের এক শক্তি(শালী সংগঠন গড়ে তোলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনীতি ও মতাদর্শে বেশ কয়েকটি রূপান্তর ঘটে। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বামপন্থী অনুগামীরা ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। এই দশকে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট, রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েসন, রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন ট্রটস্কি গোষ্ঠীও কাজ করতে থাকে। এ ছাড়া, সংগঠিত দলীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত(না হয়েও স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী অধ্যাপক এন জি রঙ্গা ও ইন্দুলাল ইয়াগানকের মত বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি(রা সেই সময়ে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে স(ম হন।

মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সিপিআই, সিএসপি, নেহ(, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি এক অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুসরণ করে, যা ১৯৩৫ সালের পরে তাঁদের এক সঙ্গে কাজ করতেও ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের গু(ত্ব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই কর্মসূচির প্রধান দিকগুলি ছিল ঃ ধারাবাহিক সত্রি(য় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, জমিদারি প্রথার বিরোধিতা, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করা, স্বাধীন ভারতকে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রদান করা এবং এক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী বিদেশনীতি প্রণয়ন করা।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বামপন্থীরা সব থেকে সাহসী, লড়াকু ও আত্মত্যাগী হলেও তারা জাতীয় আন্দোনে সমাজতান্ত্রিক দল ও ধারণাগুলির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। অথচ এটাই ছিল তাদের মূল ল(্য। ১৯৩০-র দশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করতেও তারা অসফল হয়। প্রকৃতপ(ইতিহাসবিদরাও এর কোনও সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি।

এই জটিল ঘটনাচত্রে(র অনেকগুলি ব্যাখ্যা নিজে থেকেই উঠে আসে। বামপন্থীরা অবধারিতভাবে শক্তি(শালী কংগ্রেসের সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে এবং এর ফলে চরম মুহূর্ত দেখা দিলে হয়তো পিছিয়ে গেছে অথবা জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের দ(িণপন্থীদের মত তারা মতাদর্শগত ও কৌশলগত নমনীয়তা দেখাতে পারেনি। কিন্তু সরলীকৃত মুক্তি(ও চরমপন্থী বাগাড়ম্বরের সাহায্যে তারা

দ(িণপন্থীদের মোকাবিলা করতে চেয়েছে। দ(িণপন্থীদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের পথ ছিল পিচ্ছিল— মতাদর্শগত প্র(্নে নয়, সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কংগ্রেসের দ(িণপন্থীদের বি(দ্ধে সব থেকে গু(তর অভিযোগ ছিল তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী, তারা গণসংগ্রাম বা গণ আন্দোলনকে ভয় পায় এবং বুর্জোয়া প্রভাব থাকায় তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা আন্তরিক নয়। এই অভিযোগগুলি নস্যাৎ করে দিতে দ(িণপন্থীদের কোনও অসুবিধা হয়নি। বামপন্থীরা না মানলেও মানুষ দ(িণপন্থীদের কথায় বি(্বাস করে। তার উদাহরণ হিসাবে তিনটি গু(ত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩৬-৩৭ সালে নির্বাচন ও পদাধিকার গ্রহণের প্র(্নে কংগ্রেসের দ(িণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীরা বিবাদে লিপ্ত হয়। তারা এই বিষয়গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(র সঙ্গে আপস বলে মনে করে। ১৯৩৯-৪২ সালে লড়াই দেখা দেয় গণ আন্দোলন সূচনা করার প্র(্নে—গান্ধিজির অনিচ্ছুক মনোভাবকে তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নরম মনোভাব হিসাবে দেখে এবং এর ফলে এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হল বলে অভিযোগ করে এবং ১৯৪৫-৪৭ সালে বামপন্থীরা নেহ(এবং মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ সমেত সব গু(ত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করে। এই সময়ে বিবাদের বিষয় ছিল (মতার হস্তান্তর, যাকে বামপন্থীরা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ মরিয়া প্রচেষ্টা ও ক্লান্ত কংগ্রেস নেতাদের (মতার প্রতি লোভ, এমনকী বি(্বাসঘাতকতা আখ্যা দেয়।

ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতেও বামপন্থীরা ব্যর্থ হয়। নেহ(ছাড়া কংগ্রেসের বাকি নেতাদের বামপন্থীরা বুর্জোয়া আখ্যা দেয়। তাদের আলোচনার প্রত্রি(য়াকে 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস' মনে করে এবং যে কোনও সাংবিধানিক পদ(েপকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুতি বলে অভিহিত করে। ভারতের সামাজিক শ্রেণিগুলি ও তাদের রাজনৈতিক আচরণ বি(েষণ করার জন্য তারা এক সরলীকৃত পথের আশ্রয় দেয়। কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালনা করার চেষ্টা করলেই বামপন্থীরা তাকে আন্দোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ হিসাবে বিবেচনা করে। তারা সর্বদা অহিংসার তুলনায় সশস্ত্র সংগ্রামকে কাম্য মনে করে এবং মতাদর্শ, জনগণের যোগদান ইত্যাদি বাদ দিয়ে সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানাতে থাকে। বামপন্থীদের ধারণা ছিল নেতৃত্ব নির্দেশ দিলেই দেশের মানুষ যে কোনও ধরনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

বামপন্থীদের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল, অল্প সময় বাদ দিলে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি(র এক সঙ্গে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া। বামপন্থীদের নিয়ে এক সংযুক্ত(মোর্চা গঠনের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে তাত্ত্বিক বিবাদ ছিল এবং তাদের নেতাদের মেজাদের প্রভেদও উপে(ণীয় ছিল না। দীর্ঘ দিন ধরে নেহ(ও সুভাষচন্দ্র এক সঙ্গে কাজ করতে পারেননি এবং ১৯৩৯ সালে তাঁদের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। নেহ(এবং সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের রাজনীতি সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হন। ১৯৩৯ সালের পরে বসু ও সমাজতন্ত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সি. এস. পি. ও কম্যুনিস্টরা একত্রে কাজ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা করে। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট এবং রায় পন্থীদের জন্য সিএসপি তার দ্বারা উন্মুক্ত(করে দেয় যাতে বেআইনি বলে ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক কাজের আইনি পথ খুঁজে পায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টরা শীঘ্রই পরস্পরের কাছ থেকে সরে যায় এবং একে অপরের ঘোর শত্রুতে পরিণত হয়। এর অনিবার্য পরিণাম হিসাবে এদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্রীরা এক ধরনের কম্যুনিস্ট-ভীতিতে আত্র(ান্ত হয় এবং কম্যুনিস্টরা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী নেতাকে সম্ভাব্য বুর্জোয়া বা মার্কিন দালাল (১৯৪৭ সালের পর) মনে করতে থাকে।

বামপন্থীরা অবশ্য ভারতীয় সমাজ ও রাজীনতিতে এক মৌলিক প্রভাব ফেলত স(ম হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের

সংগঠিত করা তাদেরকে বৃহত্তম সাফল্য। কংগ্রেসের উপর প্রভাব ফেলাও তাদের এক গু(ত্বপূর্ণ সাফল্য। সাংগঠনিক ে(ত্রে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে গু(ত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ভোট হলে তার এক-তৃতীয়াংশের উপর বামপন্থীরা তাদের প্রভাব ফেলতে স(ম হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে নেহ(ও বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুৎ পটবর্ধনের মত সমাজতন্ত্রীকে নেহ(তাঁর কার্যনির্বাহী সমিতিতে মনোনীত করেন। ১৯৩৯ সালে বামপন্থী প্রার্থী হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পদের নির্বাচনে পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৫৮০-১৩৭৭ ভোটে পরাস্ত করতে সফল হন।

রাজনীতি ও সংগঠনের ে(ত্রে কংগ্রেসকে মোটের উপর এক বামপন্থী চরিত্র দেওয়া হয়। নেহ(বলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে জোরের সঙ্গে গু(ত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে—আজ তা কিছুটা অনিশ্চিতভাবে এক নতুন সামাজিক মতাদর্শের প্রান্তে ঘোরাঘুরি করছে। এমনকী কংগ্রেসের দ(ণাপন্থীরাও স্বীকার করে নেয় যে, ভারতের মানুষের দারিদ্র ও দুর্দশার কারণ শুদ্ধ ঔপনিবেশিক শাসন নয়, ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোও তার জন্য দায়ী এবং এর ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন করা আবশ্যক। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে অনুমোদিত মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নীতি সংত্র(ান্ত প্রস্তাব, ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত আর্থিক নীতি, ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, ১৯৩৮ সালে এক জাতীয় যোজনা কমিটি গঠন এবং অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত বিষয়গুলিতে গান্ধিজির ত্র(মশই চরম অবস্থানের দিকে সরে আসার মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের উপর বামপন্থীদের প্রভাবই প্রতিফলিত হয়। সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোশিয়েসন গঠন এবং ১৯৩৬ সালে অল ইন্ডিয়া স্টেটস পিত্তপলস্ কনফারেন্স আহ্বান করা বামপন্থীদের অন্যান্য কয়েকটি গু(ত্বপূর্ণ সাফল্য। অল ইন্ডিয়া ইউমেনস্ কনফারেন্সও বামপন্থীরা সত্রি(য় ভূমিকা গ্রহণ করে। সব থেকে বড় কথা, কম্যুনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মত দুটি বড় বামপন্থী দল গঠিত হয় অথবা গঠিত হতে থাকে।

২.৩ কংগ্রেস ও নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি

ব্রিটিশদের ভারত অধিকারের নকশাটি বহু বর্ণরঞ্জিত। তারা বিভিন্ন কৌশলে দেশের বিভিন্ন অংশকে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এবং এর পরিণাম হিসাবে এই উপমহাদেশের দুই-পঞ্চমাংশ নৃপতি-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও কা(্মীরের মত ভারতীয় রাজ্য, যেগুলি আয়তনে বহু ইউরোপীয় দেশের সমান। আবার এমন বহু ছোট ছোট রাজ্যও ছিল যাদের জনসংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, এদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা সবাই ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রধানত্ব স্বীকার করত।

এর প্রতিদান হিসাবে ব্রিটিশরা নৃপতিদের স্বৈরাচারী শক্তি(র বি(দ্ধে যে কোনও রকম প্রতিরোধ বা সংগ্রামকে দমন করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির বড় অংশেই একনায়কতন্ত্র চালু ছিল, যেখানে সমস্ত (মতা শাসক বা তাদের অনুগামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই রাজ্যগুলিতে ভূমি করের হার ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় বেশি ছিল এবং আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকারের মাত্রা সাধারণত খুবই কম ছিল। রাজত্বকে যথেচ্ছভাবে নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার তাদের লাগামহীন অধিকার ছিল— এর ফলে তারা প্রায়শই বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। এদের মধ্যে কিছু কিছু আলোকপ্রাপ্ত নৃপতি ও তাদের মন্ত্রীরা সময়ে সময়ে প্রশাসন, কর ব্যবস্থা ইত্যাদির সংস্কার করার প্রচেষ্টা করেছিল, এমনকী জনগণকে সরকারে অংশগ্রহণ করতেও অনুমতি

দিয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ নৃপতি-শাসিত রাজ্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শি(াগত দিকে পশ্চাৎপদ ছিল—যদিও এর জন্য তারা নিজেরা পুরোপুরি দায়ী ছিল না।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি যে অবস্থানে নিজেদের আবিষ্কার করেছিল, তার জন্য শেষমেশ ব্রিটিশ সরকারই দায়ী। জাতীয় আন্দোলন ত্র(মশ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকলে এই নৃপতিদের তার বি(দ্ধে এক প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ার নির্দেশ দেওয়া শু(হয়েছিল। বরোদার মহারাজার মন কেউ জাতীয়তাবাদের প্রতি কোনও রকম সহানুভূতি প্রদর্শন করলে তাকে ব্রিটিশদের রোষের মুখে পড়তে হত। ব্রিটিশদের অবিরাম নজরদারি ও হস্ত(েপের ফলে বেশ কয়েকজন সংস্কারকামী শাসকও সেরকম কোনও উদ্যম নেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিত্র(ম অবশ্যই ছিল— বড়োদা ও মহীশূরের মত কিছু রাজ্য প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও শি(াগত সংস্কারের কাজ হাতে নেয় এবং শিল্প ও কৃষি (ে ত্রে যথেষ্ট উন্নতি করতে সফল হয়।

২.৪ প্রজামণ্ডল আন্দোলন

ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি ও তার সঙ্গে গণতন্ত্র, দায়িত্বশীল সরকার ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বর্ধিত সচেতনতা অনিবার্যভাবে রাজ্যগুলির মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যেসব বিপ-বী সন্ত্রাসবাদীরা ব্রিটিশ ভারত থেকে পালিয়ে রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারাই সেখানে মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে আসেন। ১৯২০ সালের অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন রাজ্যগুলিতে আরও বেশি প্রভাব ফেলতে স(ম হয়। মোটামুটি এই সময়ে এবং এর প্রভাবে রাজ্যগুলির মানুষ বেশ কয়েকটি স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। যে সব রাজ্যে এই ধরনের প্রজামণ্ডল গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ছিল মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, বরোদা, কাথিয়াওয়াড়ি ও দা(িণাত্যের রাজ্যগুলি, জামনগর, ইন্দোর ও নবনগর। এই প্রত্রি(য়া ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে চলে আসে যখন অল ইন্ডিয়া স্টেট পিওপল্স কনফারেন্সে রাজ্যগুলি থেকে সাতশো রাজনৈতিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এর প্রধান উদ্যোত্ত(া ছিলেন বলবন্তরাজ মেহতা, মাণিকলাল কোঠারি এবং জি আর অভয়ংকর।

ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতি কংগ্রেসের নীতি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে নাগপুরে, যখন সেখানে নৃপতিদের তাদের রাজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অনুমতি দিতে অনুরোধ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেস অবশ্য একই সময়ে একথাও স্পষ্ট করে দেয় যে রাজ্যের অধিবাসীদের কংগ্রেসের সদস্য হবার অনুমতি দিলেও তারা কংগ্রেসের নামে নিজের নিজের রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে পারবে না। রাজনৈতিক কাজ করতে হলে তা করতে হবে ব্যক্তি(হিসাবে অথবা স্থানীয় কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে। ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রভেদ (রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যেও), রাজ্যগুলিতে নাগরিক অধিকারের অভাব যার মধ্যে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত(, সেখানকার মানুষের রাজনৈতিক পাশ্চাৎপদতা এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির আইন সঙ্গত স্বাধীন সত্তা— এগুলির পরিপ্রে(িতে কংগ্রেসের এই বিধিনিষেধ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এগুলি করা হয় রাজ্যগুলিতে এবং ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন আন্দোলনের স্বার্থে। এদের মূল ল(্য ছিল রাজ্যের মানুষদের নিজস্ব শক্তি(বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা এবং নিজেদের দাবির সমর্থনে নিজেদেরই লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করা। ঘরোয়াভাবে কংগ্রেস এআইপিসি সমেত রাজ্যগুলির বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলত। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস ১৯২০ সালের প্রস্তাবটিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং বিখ্যাত লাহোর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নেহ(হলেন, ''ভারতীয় রাজ্যগুলির প(ে অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকা সম্ভব

নয়.... এই রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে শুধু সেই সব রাজ্যের মানুষরা।'' পরবর্তীকালে কংগ্রেস নৃপতিদের কাছে রাজ্যগুলির মানুষকে মৌলিক অধিকার প্রদান করার দাবি পেশ করে।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত(ঘটনা ভারতীয় রাজ্যগুলির পরিস্থিতিতে স্পষ্ট পরিবর্তন আনে। প্রথমত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এক যুক্ত(রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিকল্পনা করা হয় যেখানে ভারতীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে এক প্রত্য(সাংবিধানিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবে এবং রাজ্যগুলি যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। কিন্তু এখানে একটি ধাঁধা ছিল ঃ এই প্রতিনিধিরা গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হবেন না, নৃপতিরাই তাদের মনোনীত করবে। যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে এরা এক র(ণশীল জোট গড়ে তুলবে যাতে জাতীয়তাবাদী চাপ প্রতিরোধ করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। কংগ্রেস, এ আই এস পি সি এবং রাজ্যগুলির অন্যান্য সংগঠন সরকারের এই চাল ধরে ফেলে এবং দাবি করে যে নৃপতিদের মনোনীত নয়, শুধু জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই বিধানমণ্ডলীতে পাঠাতে হবে। রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি এর ফলে জ(রি হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা স্থাপিত হওয়া কংগ্রেস (মতা পেয়েছে— এই সংবাদ ভারতীয় রাজ্যগুলির মানুষের মধ্যে এক নতুন আত্মবি(্বাস ও আশার সঞ্চার করে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে প্রেরণা যোগায়। নৃপতিরাও এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবের মুখোমুখি হয়— কংগ্রেস যেখানে স্রেফ এক বিরোধী দল না হয়ে (মতাসীন দলে পরিণত হয়েছে এবং সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলিতে প্রভাব বিস্তার করার শক্তি(র সহায় করেছে।

প্রকৃতপ(১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রাজ্যগুলি যেন নতুন করে জেগে ওঠে। এই সময়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠন ও অন্যান্য সংস্কারের দাবিতে রাজ্যগুলিতে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়। যে সব রাজ্যে এই ধরনের কোনও সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না, সেই সব রাজ্যের প্রজামণ্ডলের সংখ্যা ব্যাঙের ছাতার মত বেড়ে ওঠে। জয়পুর, কাশ্মীর রাজকোট, পাতিয়ালা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং উড়িষ্যার রাজ্যগুলিতে বড় আকারের আন্দোলন গড়ে ওঠে।

এই সব ঘটনার ফলে কংগ্রেসের নীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৩৮ সালের হরিপুরা অধিবেশনেও কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে, রাজ্যগুলিতে আন্দোলন কংগ্রেসের নামে নয়, নিজস্ব শক্তি(তে ও স্থানীয় সংগঠনগুলির মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সেখানকার মানুষের নতুন উদ্দীপনা ল(করে কয়েক মাস পরে গান্ধিজি ও কংগ্রেস এই প্র্ে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। কংগ্রেসের চরমপন্থী ও সমাজতন্ত্রী অংশ এবং রাজ্যগুলির রাজনৈতিক কর্মীরা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি জানিয়ে আসছিল।

দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সূচনা হলে রাজনৈতিক আবহাওয়াতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে, সরকার ডিফেন্স অফ অন্ডিয়া (লস চালু করে এবং রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি অসহিষ্ণু(তা বেড়ে ওঠে। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শু(হলে অবস্থা চরমে ওঠে। তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলির মধ্যে কোনও প্রভেদ না করে সংগ্রামকে রাজ্যগুলির মানুষদের কাছে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানায়। এর ফলে রাজ্যগুলির মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি ছাড়াও ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বলে ও রাজ্যগুলিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার দাবি করে।

দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর (মতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা শু(হলে রাজ্যগুলির সমস্যা তাতে কেন্দ্রবিন্দু গ্রহণ করে। এটা জাতীয় নেতৃত্ব, বিশেষত সর্দার প্যাটেলের কৃতিত্ব যে, ব্রিটিশ সর্বপ্রধানত্বের অবসানে

রাজ্যগুলি আইনত স্বাধীনতা লাভ করার ফলে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে তাঁরা সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণে আনেন। অধিকাংশ রাজ্যই কূটনৈতিক চাপ, হুমকি, গণ আন্দোলন ইত্যাদির সম্মিলিত চাপে মাথা নোয়াতে শু(করে এবং নিজেরাও উপলব্ধি করে যে স্বাধীনতা তাদের কাছে কোনও বাস্তবসম্মত বিকল্প নয়। এর ফলে তারা 'ইনস্ট্রুমেন্টস অফ অ্যাকসেশনে' স্বা(র করে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর, জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের মত কিছু রাজ্য শেষ মুহূর্ত অবদ্ধি প্রতিরোধ চালানোর চেষ্টা করে। শেষে শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদ নিজের অবস্থান বজায় রাখতে স(ম হয় এবং স্বাধীনতার জন্য বাস্তবিকই গু(গম্ভীর দাবি তোলে।

২.৫ মুসলিম লিগ ও পাকিস্তান আন্দোলন

পাকিস্তানের ধারণাটি প্রথম এক কেমব্রিজ শি(ত যুবক, রহমত আলির মনে দানা বাঁধে। তিনি তাঁর এই ধারণার কথা গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সদস্যদের জানান। তাঁর মৌলিক তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র মৌলিক মহাজাতি। তিনি বলেন ঃ ''আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার ও বিবাহ আইন হিন্দুদের থেকে আলাদা। এই প্রভেদগুলি শুধু বৃহত্তর নীতিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের (ুদ্রাতি(ুদ্র স্তর পর্যন্ত সেগুলি বিস্তৃত। আমরা হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে আহার করি না, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই না। আমাদের রীতিনীতি, পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার, এমনকী খাদ্যাভ্যাস ও পোষাক পরিচ্ছদ ও ভিন্ন রকমের।'' সেই সময়ে কেউই তাঁর এই ভাবনাকে বিশেষ গু(ত্ব দেননি। কিন্তু ত্র(মশ তাঁর এই তত্ত্ব ভারতীয় মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয় মনে হতে থাকে। মুসলিম লিগের সভাপতি এম. এ. জিন্না সাফল্যের সঙ্গে এই ভাবনার সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকেন, যার পরিণামে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভাজিত হয় এবং পাকিস্তান নামে এক নতুন দেশের জন্ম হয়।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বহু শতাব্দী ধরে এই উপমহাদেশে একত্র বসবাস করে ও ত্র(মশ একে অপরের সঙ্গে বেঁচে থাকতে শেখে ও হিন্দু ও মুসলমানেরা এমন কোনও অভিন্ন ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি যার উপর তারা একটিই দেশ গঠন করতে স(ম হয়। ব্রিটিশ শাসকরা এই অবস্থারই সুযোগ গ্রহণ করতে সফল হয়। কাজেই সত্যের কাছাকাছি বলে এটাই ধরে নেওয়া যায় যে, ধর্ম ও সংস্কৃতির (ে ত্রে তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ ছিল এবং যে একটি (ে ত্রে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক (ে ত্রে তাদের মধ্যে সমতার সম্ভাবনা ছিল, তাও হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে ব্রিটিশরা এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে এই প্রভেদগুলিকে আরও প্রকট করে তুলেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না। মুসলিমরা মনে করত যে ব্রিটিশরা তাদের হাত থেকে ভারতের রাজনৈতিক (মতা কেড়ে নিয়েছে এবং ব্রিটিশরা সর্বদাই মুসলিমদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু মনে করত। ওয়াহাবি বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনকে বিপদের মুখে ফেলার পরে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়। বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশরা মুসলিমদের বি(দ্ধে হিন্দুদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে কারণ তাদের ধারণা হয় মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছে। তারা কচ্ছের খান বাহাদুর খানের বি(দ্ধে বেরিলীর হিন্দু তালুকদারদের উস্কে দেয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি লরেন্স রাজপুত্র শাসকদের মুসলিমদের বি(দ্ধে প্ররোচিত করেন। তিনি বলেন ঃ ''একথা সবার জানা নেই যে প্রথমে সম্রাট আলমগীর ও পরে হায়দার আলি হাজার হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেন, ধর্মস্থানগুলি অপবিত্র করেন ও তাদের বহু মন্দির ধ্বংস করেন।'' এদিকে

মুসলিমরা ইংরাজি শি(া ও পশ্চাত্য সংস্কৃতিকে উপে(া করে এবং চাকুরি ও আধুনিকতার স্বাদ থেকে রি(ত থেকে যায়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি ত্র(মশ উল্টো দিকে ঘুরে যায়। হিন্দুরা ব্রিটিশদের শত্রুতার ল(্য হয়ে ওঠে। ইংরাজী শি(া ও পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে এসে তারা ত্র(মশ জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প(ে আরও বেশি বিপজনক হয়ে ওঠে। এর ফলে ব্রিটিশরা হিন্দুদের বি(দ্ধে মুসলিমদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ডিভাইড অ্যান্ড (ল' তত্ত্বটি আসলে বিদ্রোহের সময়েই ব্রিটিশরা প্রয়োগ করেছিল— যদিও পরবর্তীকালেই সেটিকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। ১৮৭০ সাল থেকে ব্রিটিশ নীতির এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন উপায়ে মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে ও সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিতে থাকে। এর পরিণামে এলাহাবাদ, বেনারস, বালিয়া, গাজীপুর, আজমগড় ইত্যাদি স্থানে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা ব্রিটিশদের প্রশাসনিক নীতির এক অঙ্গ হয়ে ওঠে। ১৮৭১ সালে স্যার ইউলিয়াম হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মুসলিম সমাজের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনের উপর গু(ত্ব দেওয়া হয়। তিনি লেখেন ঃ ''শত্রুতা না চালিয়ে গিয়ে এই মুহূর্তে মুসলিমদের সঙ্গী করে নেওয়াই সুবিধাজনক।'' ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকরাও একই মতের অংশীদার ছিলেন।

ব্রিটিশ ও মুসলিমদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা করেন। ইংরাজি শি(া, আধুনিক মনস্কতা ও ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের উপযোগিতার কথা তিনি মুসলিমদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি ব্রিটিশদের বলেন যে মুসলিমরা ব্রিটিশ-বিরোধী নয়— একটু নিরাপত্তা পেলে তারা ব্রিটিশদের খুবই অনুগত হয়ে উঠবে। আলিগড় আন্দোলন ও আলিগড় বি(বিদ্যালয় তাঁর এই মত প্রচার করতে যথেষ্ট সফল হয়। ভারতীয় মুসলিমদের শি(া, আধুনিকীকরণ ইত্যাদিতে তিনি এক বড় ভূমিকা নেন। গাজীপুরে তিনি ১৮৬৪ সালে একটি ইংরাজি শি(ার স্কুল ও পরের বছর একটি বিজ্ঞান শি(া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে 'অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ আলিগড় মুসলিম বি(বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে ওঠে, ১৮৮৬ সালে 'মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়, ১৮৮৮ ও ১৮৯৩ সালে যথাত্র(মে 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিকে অ্যাশোসিয়েশন' ও মহমেডান ডিফেন্স অ্যাসোশিয়েশন অফ আপার ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির প্রত্যেকটি মুসলিমদের যথেষ্ট উপকারে আসে। সৈদয় আহমেদ খান ও তাঁর আলিগড় আন্দোলন— উভয়েই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এর কারণ খান তাঁর কাজের জন্য ব্রিটিশদের উপর অতিরিক্ত(নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁর এই নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে। খান নিজে এবং তাঁর আলিগড় আন্দোলন ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসেরও বিরোধিতা করতে থাকে। তিনি এক সময়ে মন্তব্য করেন ঃ ''কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল দেশের শাসন(মতা গ্রহণ করা। ভারতের জনগণের নামে তারা এই (মতা অর্জন করতে চাইলেও সংখ্যালঘু হওয়ার ফলে মুসলিমরা সে (ে ত্রে অসহায় বোধ করবে।'' অন্য এক সময়ে তিনি বলেন ঃ ''খুব সামান্য (ে ত্রেই যাদের মিল আছে, সেরকম দুটি ভিন্ন মতাবলম্বী জাতি নিয়ে একটি জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা সম্ভব নয়।'' তাঁর পথ অনুসরণ করে আলিগড় আন্দোলন এক সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে। পাকিস্তানের জন্ম দিতে এগুলি নিশ্চিতভাবে সাহায্য করে।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশরা ভারতের রাজনীতিতে 'ডিভাইড অ্যান্ড (ল' নীতি প্রয়োগ করতে শু(করে। ১৯০৬ সালে সাংবিধানিক সংস্কারের এক নতুন প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর ব্যক্তি(গত সচিব স্মিথ মুসলিমদের এক প্রতিনিধিদলকে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সা(াৎ করার পরামর্শ দেন। স্যার আগা খানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সা(াৎ করে এবং মুসলিমদের জন্য পৃথক

নির্বাচকমণ্ডলী এবং চাকুরি ও শি(ার ে(ত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধার দাবি জানায়। এর ফলে ১৯০৯ সালের 'রিফর্ম অ্যাক্ট' বা সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত(করা হয়, যা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে আরও উৎসাহ যোগায়, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই পদ(পগুলি সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিতে ব্রিটিশদের সচেতন প্রয়াসেরই এক অঙ্গ।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা অবশ্য রাজনৈতিক ে(ত্রে সংগঠিত হয় ভারতীয় মুসলিম লিগের পতাকার নীচে। ১৯০৬ সালে ৩০শে ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লা খান মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা করেন। লিগের ল(্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করা, মুসলিমদের অধিকার র(া করা, জনজীবনে শি(িত মুসলিমদের জন্য আরও ভালো সুযোগ সৃষ্টি করা ও ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রগতিকে প্রতিহত করা। এইভাবে লিগ সৈয়দ আহমেদ খানের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। শু(থেকেই লিগ কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে থাকে। লিগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে এবং ১৯০৫ সালে ও পরবর্তী সময়ে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের বিরোধিতা করে। লিগ শু(থেকেই ইসলাম ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে লিগের সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরও গভীর হয়। ১৯০৭ সালের করাচি অধিবেশনে লিগের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ ''যদি এক বালকের (মহম্মদ বিন কাশিম) নেতৃত্বে সামান্য কয়েকজন মানুষ সিন্ধ অঞ্চলে কলিমা শি(া দিতে পারে ও শরিয়ত আইন চালু করতে পারে, তাহলে সাত কোটি মুসলমান কি তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে না?'' অবশ্য নবাব সৈয়দ আহমেদ, মৌলানা মহম্মদ-উল-হাসানের মত কিছু মুসলিম নেতা লিগের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরোধী ছিলেন— যদিও তাঁরা লিগের আদর্শে কোনও পরিবর্তন আনতে স(ম হননি। লিগের চিরস্থায়ী ল(্য ও আদর্শ মুসলিম সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ১৯০৯ সালের সংস্কারে লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯১১ সালের পর থেকে অবশ্য ভারতের বাইরে কিছু ঘটনা অল্প সময়ের জন্য লিগ ও কংগ্রেসকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯১১ সালে ইটালি ত্রিপোলি আত্র(মণ করে যা তুরস্কের এলাকার এক অংশ ছিল। ১৯১১-১২ সালের বলকান যুদ্ধ তুরস্ককে আরও দুর্বল করে তোলে। ব্রিটেনের শত্রু হিসাবে তুরস্ক প্রথম বি(েযুদ্ধে যোগদান করে। এই সব সময়ে ভারতীয় মুসলিমরা মুসলিম বি(ে, বিশেষ করে তুরস্কের প্রতি তাদের সমবেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু ব্রিটিশদের এই রকম কোনও সমবেদনা ছিল না। তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশদের অনড় মনোভাব এবং তার সুলতানের 'খলিফা' উপাধি কেড়ে নেওয়ায় ভারতীয় মুসিলমরা আরও (ুব্ধ হয়। এর ফলে লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে ইচ্ছুক হয়। কংগ্রেস লিগের কাছে আকর্ষণীয় বেশ কিছু শর্তে রাখে। সে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, সাম্প্রদায়িক ভেটো এবং 'ওয়েটেজ' কে স্বীকার করতে সম্মত হয়। এর ফলে ১৯১৬ সালে ল(ৌতে লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ল(ৌ চুক্তি(সম্পাদিত হয়। প্রথম বি(েযুদ্ধের সমাপ্তির পর গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসই কার্যত খিলাফত আন্দোলন পরিচালনা করে। এছাড়া, গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শু(করার এক প্রাথমিক ল(্য ছিল জাতীয় স্বার্থে মুসলিমদের সহানুভূতি অর্জন করতে স(ম হওয়া। কিন্তু কংগ্রেস, ও মুসলিম লিগের মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯২১ সালে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহের ফলে আবার সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠে। এর ফলে ১৯২২ ও পরে ১৯২৪ সালে ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং সাংবিধানিক সংস্কারের নতুন পরিকল্পনা রচনা করতে সাইমন কমিশনকে নিয়োগ করে। এই কমিশনের সব সদস্যই ে(তাঙ্গ ছিলেন সুতরাং কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কট করে এবং দেশজুড়ে প্রতিবাদ সভা, হরতাল ও মিছিলের আয়োজন করে। লিগ অবশ্য এই ব্যাপারে কংগ্রেসকে সহযোগিতা করেনি। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস পণ্ডিত মতিলাল নেহ(র অধ্য(তায়

এক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে এমন এক সূত্র ও পরিকল্পনা রচনা করা যা লিগের প(গ্রহণযোগ্য হয়। এই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে, যা নেহ(-রিপোর্ট বলে পরিচিত হয়। নেহ(র রিপোর্টের সূত্রের ভিত্তিতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের দাবিতে সে লিগের সমর্থন চায়। কিন্তু জিন্না তাতে সম্মত হন না। এর বদলে জিন্না তাঁর 'চোদ্দ-দফা পরিকল্পনা' পেশ করেন ও কংগ্রেস তা বর্জন করে। ১৯৩০ সালে লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু জিন্নার বাড়তি দাবিগুলি মেনে নেওয়া তাঁর প(সম্ভব হয় না। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও কংগ্রেস যোগ না। এর ফলে লিগ ও কংগ্রেসের বিবাদ অমীমাংসিত থেকে যায়। এর মূল কারণ এই যে জিন্না ইতিমধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা হল দুটি স্বতন্ত্র দেশ বা মহাজাতি। কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে শুধু মুসলিম লীগের। কংগ্রেস এই ধারণাকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফলে এদের মধ্যেকার অচলাবস্থা থেকেই যায়। মুসলিম লিগ তার দাবিগুলিতে অনড় থাকে এবং তাদের দাবিগুলির সমর্থনে সংহতি প্রদর্শন করতে মুসলিমদের হিন্দুদের বি(দ্ধে প্ররোচনা দিতে থাকে।

১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে লিগ সোজাসুজি ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবি করে। পাকিস্তানের ধারণার এক অতীত ইতিহাস আছে। ১৯২৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বহু ভারতীয় মনে করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়। লিগও ত্র(মশ মনে করতে থাকে যে অখণ্ড ভারতে মুসলিমদের প(নিরাপদ ও সুখি জীবন কাটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ১৯৩০ সালে লিগের সভাপতি স্যার মহম্মদ ইকবাল বলেন যে, পৃথক বাসভূমি থাকলেই মুসলিমদের স্বার্থর(া করা সম্ভব। জিন্নাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তাঁর এই ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন ঃ ''ভারতে এই ব্যবস্থা সম্ভব না হলে একমাত্র বিকল্প হল গৃহযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মাধ্যমে যা প্রকৃতপ(বেশ কিছু কাল ধরে চলে আসছে। ''পাকিস্তানের ধারণার জন্ম না দিলেও তিনি ভারতীয় মুসলিমদের পৃথক বাসভূমির প(পাতী ছিলেন এবং তাঁর ভাবনা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় মুসলিমদের এক বড় অংশকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'নাউ অর নেভার' শীর্ষক এক পুস্তিকায় কেমব্রিজ বি(বিদ্যালয়ের ছাত্র রহমত আলি ও তাঁর তিন বন্ধু প্রথম পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই প্রস্তাবিত এলাকায় দ(ণ হায়দ্রাবাদ, উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত(করার কথা বলা হয়। পরর্বতী কালে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমি দাবি করার সময় লিগ 'পাকিস্তান' নামটি গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালে ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেস ও লিগের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী, যথাত্র(মে স্যার সিকন্দর হায়াত খান, ফজলুল হক ও স্যার মহম্মদ মাদুল্লা খান ১৯৩৭ সালে লখ্নৌর বার্ষিক অধিবেশনে লিগকে সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে অসফল হলেও লিগ হিন্দুদের, বিশেষণ কংগ্রেসের বি(দ্ধে মিথ্যা প্রচার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে যেতে থাকে। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রসভাগুলি পদত্যাগ করলে লিগ আনন্দে এই বছরের ২২শে ডিসেম্বর 'দি ডেলিভারেন'' বা 'মুক্তি(দিবস' হিসাবে পালন করে। তার প্রচারে লিগ বেশির ভাগ (ত্রেই ধর্মের আশ্রয় নেয় এবং তার এই কৌশল যথেষ্ট সফল হয়। দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের সূচনা ও লিগকে বেশ কিছু (ত্রে সহায়তা করে। ব্রিটিশরা ভারতের মানুষকে আ(াস দিতে থাকে যে তাদের চূড়ান্ত ল(্য হল ভারতকে ডোবিনিয়ানের মর্যাদা প্রদান করা। এই সময়ে তাঁর দাবিগুলি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা লিগ বুদ্ধিমানের কাজ বলে

মনে করে। এর ফলে ১৯৪০ সালে লাহোরের বার্ষিক অধিবেশনে লীগ মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমি দাবি করে। কিন্তু তখন লিগ 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করেনি। কিছু ভারতীয় ও ব্রিটিশ সংবাদও মুসলিমদের পৃথক রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করার সময়ে এই শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে। পরে ১৯৪৩ সালে লিগ এই নামটিকে গ্রহণ করে।

১৯৪০ সালে তাঁর আগস্ট অফার' বা আগস্ট ঘোষণায় লর্ড লিনলিথগো এই প্রথম মুসলিমদের আবদ্ধ করেন যে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে কোনও কোনও সমঝোতা হলে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৪২ সালে ত্রি(পস প্রস্তাব পেশ করা হলে লিগ ও কংগ্রেস উভয়েই তা মানতে অসম্মত হয়। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা করে। লিগ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং যখন সমস্ত কংগ্রেস নেতাই জেলে বন্দি তখন পাকিস্তানের ধারণাটি নিয়ে ব্যাপক প্রচার করে। ধর্মের নামে লিগ মুসলিমদের সমর্থন ভি(া করে এবং তাতে মুসলিম ধর্ম প্রচার করা বিপুল ভাবে সাড়া দেন। পাকিস্তানের সমর্থনে প্রচার করার উদ্দেশ্যে আলিগড় মুসলিম বি(বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি না মানা হলে লিগ এমনকী গৃহযুদ্ধের হুমকী দেয়। উত্তর-পশ্চিমে পাঠানদের এক সমাবেশে জিন্না বলেন ঃ ''আপনারা কি পাকিস্তান চান বা চান না? পাকিস্তান চাইলে লিগকে ভোট দিন। আজ আমরা আমাদের কর্তব্য পালন না করলে আপনারা 'শূদ্রে' পরিণত হবেন ও ইসলাম ভারত থেকে মুছে যাবে। আমি কখনও মুসলিমদের হিন্দুদের দাস হতে দেব না।'' এইভাবেই সারা দেশ জুড়ে লিগ তার প্রচার চালায়। একথা প্রকাশ্যে বলা হতে লাগল যে লিগকে সমর্থন করার অর্থ ইসলামকে সমর্থন করা। বহু সংবাদপত্র পাকিস্তান গঠনের দাবিকে সমর্থন জানাতে লাগল। এদের মধ্যে ছিল ইংরাজি সংবাদপত্র 'ডন', উর্দুতে 'অনজাম', 'ইনকিলাব', বাংলাতে 'আজাদ' ইত্যাদি। লিগের প্রচার সাফল্য লাভ করল এবং অধিকাংশ মুসলিম পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিকে সমর্থন জানাল। অস্পৃশ্য সমাজের নেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সি রাজাগোপালাচারীও লিগের দাবিকে সমর্থন করলেন। ১৯৪৪ সালে রাজাগোপালাচারী তাঁর সমঝোতা সূত্র জিন্নার কাছে পেশ করেন। এতে প্রত্য(ভাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি না থাকায় জিন্না এই সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৫ সালে সিমলা অধিবেশনে লিগ নিজকে সমস্ত ভারতীয় মুসলিমের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে এবং কংগ্রেসের মনোনীত মৌলানা আবদুল কালাম আজাদকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে নিতে অস্বীকার করে। এর ফলে সিমলা অধিবেশন ও ওয়াভেল পরিকল্পনা, দুই-ই ব্যর্থ হয়। ১৯৪৫ সালে অ্যাটলি ব্রিটেনে লেবার পার্টির সরকার গঠন করেন। ওই একই বছরে ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ভারতে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে ও মে মাসে তার প্রস্তাব পেশ করে। কংগ্রেস ও লিগ, দুই দলই প্রথমে তা মেনে নিলেও পরে লিগ তা প্রত্যাখ্যান করে ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এর প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট লিগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করে, যার ফলে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে জহরলাল নেহ(রে নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। প্রশাসনে নিজের অবস্থান শক্তি(শালী করতে লিগ এতে যোগ দিতে সম্মত হয় ও তাতে পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠায়। ভারতীয় গণ পরিষদ (constituent assembly) ডিসেম্বর মাসে তার প্রথম সভা করে। কংগ্রেস একে সার্বভৌম মনে করলেও লিগ সেই মত মানতে অস্বীকার করে। এদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে, যার প্রচুর সম্পত্তি এবং প্রাণহানি ঘটে। হিন্দু ও মুসলিম, দুই সম্প্রদায়েরই ল(ল(মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ও নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশরা ঘোষণা করে যে তারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যাবে। ভারতের সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয়

করে পাঠানো হয়। ১৯৪৭ সালের ২৭শে মার্চ লিগ 'পাকিস্তান দিবস' পালন করে। এর ফলে বিশেষত পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলাতে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, নারীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। গান্ধি ছাড়া নেহ(ও সর্দার প্যাটেলের মত বহু কংগ্রেস নেতাই লিগের পাকিস্তানের দাবির বিরোধিতা করার অর্থহীনতা উপলব্ধি করেন। ভিপি মেনন ভারত বিভাজনের এক খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করেন। ব্রিটিশ সরকার এতে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং 'জুন প্ল্যান' বা 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' নামে এই প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও লিগের কাছে উপস্থাপিত করেন। দুটি রাজনৈতিক দলই এই প্রস্তাব মেনে নেয়। এর পরে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট বা ভারতীয় স্বাধীনতা, 'আইন, ১৯৪৭ অনুমোদন করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

২.৬ সূত্র নির্দেশ

১। Handa R.L. : History of Freedom Movement in Princely states. N. Delhi, 1968.

২। Walia Ramesh : Praja Mandal Movement in East Punjab States, Patiala, 1972.

৩। Hardy Peter : The Muslims of British India, Cambridge, 1972.

৪। Hashan Mushirul : Nationalism and Communal Politics in India, N. Delhi, 1991.

৫। Chandra Bipan : Communalism in Modern India, New Delhi, 1984.

৬। Chandra Bipan : The Indian Left : Cuetical Appraisals, N. Delhi, 1983.

৭। Adhikari G. (ed.) : Documents of History of the communist Party of India.

২.৭ অনুশীলনী

নমুনা প্র(মালা ঃ

১। দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্র(ঃ

১৯০৬ সাল থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ত্র(মবিকাশের বর্ণনা কর।

২। সং(প্ত উত্তরভিত্তিক প্র(ঃ

ভারতে মুসলিম লিগের জন্মের কারণ কী কী? এতে ব্রিটিশদের 'ডিভাইড অ্যান্ড (ল' নীতির অবদান কতখানি?

৩। অবজেকটিভ ধরনের প্র(ঃ

কখন এবং কোথায় পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়?

২.৮ সংক্ষিপ্তসার

এই পর্যায়ে বহু রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করার দাবী ক'রে। এই পর্যায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং প্রজামণ্ডল আন্দোলন। ১৯৩৫ সালের পরে মুসলিম রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার দিকে সরে আসে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের ফলে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' বিকাশ হয় এবং শেষে ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মুসলিম লিগের এই পৃথক রাষ্ট্রের দাবির পরিণামে শেষে ভারত ভাগ হয়ে যায় এবং স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসাবে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়।

একক ৩ ❑ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা আগস্ট বিদ্রোহ

গঠন ঃ

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঃ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪২

৩.৩ সূত্র-নির্দেশ

৩.৪ অনুশীলনী

৩.৫ সংি(প্তসার

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রে(াপট সম্পর্কে আলোচনা করা, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদন করে কংগ্রেস কীভাবে এই গণ আন্দোলন শু(করল তার ব্যাখ্যা করা, এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রকৃতি ও তাৎপর্যকে চিহ্নি(ত করা।

৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঃ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪২

১৯৪২ সালে ভারত বি(্বযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের খুব কাছাকাছি চলে আসে। মিত্রশক্তি(র সদস্যেরা ভারতের রাজনৈতিক ভবিতব্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি (জভেল্ট ও চিনের চিয়াঙ কাই শেক ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোনও এক বোঝাপড়া করে নেবার জন্য ব্রিটিশদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এক গু(ত্বপূর্ণ মুহূর্তে এই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রি(পসকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এটা সত্য যে দেশের ভিতরে বা বাইরে, কোনওখানেই সেই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক ছিল না। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার দিন থেকেই জাপান নিরন্তর আক্র(মণ চালাতে থাকে— ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়, ৭ই মার্চ রেঙ্গুন ও ১২ই মার্চ আন্দামানও জাপানের দখলে আসে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতের চারদিকের সমুদ্র জাপানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্রি(পস যখন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন, তখন ত্রিংকোমালি, কাকিনাড়া ও

বিশাখাপত্তনমের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। মাদ্রাজ সরকার তার কার্যালয়গুলিকে উপকূল অঞ্চল থেকে সরিয়ে ভিতরের দিকে নিয়ে যায় এবং ত্রিংকোমালি থেকে কলকাতা—সমগ্র পূর্ব উপকূল ও নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কমিটি স্থির করে যে আত্র(মণকারী শক্তি(গুলিকে ভারতের মানুষ অহিংস অসহযোগিতার মাধ্যমে মোকাবিলা করবে এবং তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের সহযোগিতা করবে না। কংগ্রেস অবশ্য মেনে নেয় যে, ব্রিটিশ ও আত্র(মণকারীরা যেসব স্থানে সক্রি(য় যুদ্ধে লিপ্ত, সেইসব স্থানে ভারতীয় অসহযোগিতা কোনও গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে না। ক্রি(পস আগে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। ক্রি(পস ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে এসে পৌঁছোন।

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ক্রি(পস একটি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ নীতির ল(্য হল ''যত শীঘ্র সম্ভব ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা।'' (২) এই প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন মর্যাদার সব ভারতীয় ইউনিয়নের গঠনের কথা বলা হয় এবং যুদ্ধের পর তাকে ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার দেওয়া হয়। (৩) যুদ্ধের পর ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত গণ পরিষদ দ্বারা এক নতুন সংবিধানের খসড়া রচনার কথা উল্লেখ করা হয়। (৪) যুদ্ধ চলাকালীন ভাইসরয়ের কাউন্সিলকে ভারতীয় নেতাদের এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে পুনর্গঠিত করার কথা বলা হয়— অবশ্য নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত বি(্বযুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের প্রতির(া ভার ব্রিটিশ সরকারের কাছে থাকবে বলে মনস্থ করা হয়।

কংগ্রেসের নেতারা দাবি করতে থাকেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পূর্ণ (মতাসম্পন্ন ক্যাবিনেট সরকারের মর্যাদা দেওয়া হোক এবং প্রতির(া সমেত সমস্ত গু(ত্বপূর্ণ বিভাগগুলির দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হোক। ভারতে জাতীয়তাবাদীরা মনে করতে থাকেন যে যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য ভারতীয়দের হাতে পূর্ণ (মতা হস্তান্তর করা অত্যন্ত জ(রি। ব্রিটিশরা তখনই ভারতীয়দের হাতে কার্যকরী (মতা তুলে দেবার জন্য কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে। কাজেই ক্রি(পস ও ভারতীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা বিফল হয়। কংগ্রেসের নেতারা সেই সময়ে কিছু রাজনৈতিক লাভ আশা করছিলেন, স্রেফ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে রাজি হয়ে যাওয়ার মানসিক অবস্থা তাঁদের ছিলনা। এদিকে মুসলিম লিগও ক্রি(পসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাতে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কোনও উল্লেখ ছিল না। গণ পরিষদের ধারণা লিগের পছন্দ হয়নি, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল পরিষদে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে। লিগের নেতারা মনে করতেন যে দেশভাগই হল ''ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার একমাত্র সমাধান।'' অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিও ক্রি(পসের প্রস্তাবে অখুশি ছিল, কারণ তাঁরা নিজেদের অবস্থান শক্তি(শালী করার জন্য কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আশা করেছিল। হিন্দু মহাসভা এই পরিকল্পনাতে পাকিস্তানের ছায়া ল(করেছিল। রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একমাত্র এম. এন. রায়ের নেতৃত্বাধীন র‍্যাডিকাল ডেমোক্র(াটিক পার্টি ক্রি(পসের প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।

ক্রি(পস মিশনের ব্যর্থতার বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। ভারতীয়দের বিভিন্ন রকমের দাবি দাওয়া মেটাতে তিনি ব্যর্থ হন। সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি কাউকেই খুশি করতে স(ম হননি। ক্রি(পসের একমাত্র ল(্য ছিল এই মিশনকে সফল করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্রি(পস একা দায়ী নন। এই ব্যর্থতার জন্য ভারতের ভাইসরয়, আমলা সম্প্রদায়, লর্ড ওয়াভেল ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকেও দায়ী করা যেতে পারে। চার্চিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে চলে আসে যখন তিনি বলে ফেলেন যে ''আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার জন্য এই পদে আসীন হইনি।'' ক্রি(পস মিশনের

ব্যর্থতা গান্ধির মনোভাবে এক স্পষ্ট পরিবর্তন আনে। তখন পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চলাকলীন ব্রিটিশদের বি(দ্ধে কোনও গণ অন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এখন তিনি ব্রিটিশদের সম্পূর্ণভাবে ভারত ত্যাগ করার দাবি জানান।

ত্রি(পস মিশনের ব্যর্থতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সরকার ও কংগ্রেসের মিলিত হবার কোনও জায়গা আর অবশিষ্ট থাকে না। একদিকে সরকার (মতা হস্তান্তর করতে অসম্মত হয়, অন্যদিকে কংগ্রেস এই মনোভাবে অনড় থাকে যে একমাত্র জনগণের সরকারের মাধ্যমেই জাপানি আত্র(মণে বি(দ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধি মন্তব্য করেন যে ব্রিটিশরা ভারত দখল করে থাকার জন্যই ভারত জাপানের আত্র(মণের ল(্যবস্তু হয়ে পড়েছে। কাজেই ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। এর আগে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশদের (মতা হস্তান্তর করতে বাধ্য না করার যে যুক্তি(গান্ধি উপস্থাপিত করেছিলেন, তা বহু কংগ্রেস নেতার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু শেষে সবাই গান্ধির মতে সায় দেন এবং যাঁরা বিরোধিতা করেন, যেমন সি. রাজাগোপালাচারী, তাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। জুলাই মাসে ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় সেই মুহূর্তে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যেতে বলা হয়।

রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে ত্রি(পসের ব্যর্থতা গান্ধির দৃষ্টিতে এক নৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। তিনি একই সঙ্গে ব্রিটেনকে কপটতা বা ভণ্ডামির কলঙ্ক থেকে মুক্ত(করতে এবং ভারতীয় জনগণের মর্যাদা, আত্মবি(্বাস ও ঐক্যকে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের বিদ্বেষকে শুভেচ্ছায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো' শব্দবন্ধটি এক মার্কিন সাংবাদিক গান্ধির সঙ্গে এক সা(াৎকার নেওয়ার সময় সৃষ্টি করেন। ২৬শে এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে গান্ধি বরং এর পরিবর্তে ''ব্রিটিশদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সময়োচিত ভারত ত্যাগ'' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। তিনি একথাও বলেন যে, ''আমার প্রস্তাব অনুযায়ী তারা ভারতকে ভবিতব্য বা ঈ(্বরের হাতে ছেড়ে যাবে। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী তারা ভারতকে নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে যাবে, যে নৈরাজ্যের ফলে দেখা দেবে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও বেপরোয়া লুঠতরাজ। এর থেকেই এক নকল ভারতের জায়গায় উঠে আসবে এক সত্যিকারের ভারত।''

১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনকে সহৃদয়তার সঙ্গে ভারত ছেড়ে যেতে বলে, যাতে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে তার মাধ্যমে রাষ্টমঞ্চের সঙ্গে সহযোগিতা করে আত্র(মণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় কমিটি অবশ্য এ কথাও স্পষ্ট করে দেয় যে, ''এই আবেদনে সাড়া না পেলে কংগ্রেস অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৯২০ সাল থেকে পুঞ্জীভূত সমস্ত অহিংস শক্তি(র প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই বহুবিস্তৃত সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকতেন অবশ্যই গান্ধিজি। ''কমিটি ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সরকার এদিকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ তার মতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এপ্রিল - মে ১৯৪২) ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (১৪ই জুলাই) গৃহীত প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট বিপদজনক। ভারতকে সুরি(ত রাখার জন্য ব্রিটিশদের (মতা সম্পর্কে মানুষের মনে ঘোরতর অবি(্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয় ও ব্রিটিশদের প্রচারও মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ও চিনের জনগণের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হয় এবং সেখানে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার দাবিকে সমর্থন করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বৈঠকে অস্থায়ী সরকারের সংবিধানের মোটামুটি এক রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের কথা ভাবা হয় এবং বি(্ব শান্তি ও ঐক্যের জন্য ভারতের আশার কথা ব্যক্ত(করা হয়। প্রস্তাবের গু(ত্বপূর্ণ অংশটি এই রকম ঃ ''এই কমিটি সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে মুক্তি(ও স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ল(্যে ভারতে এক অহিংস গণ আন্দোলন

সংগঠিত করা প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে চালানো শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সমস্ত পুঞ্জীভূত অহিংস শক্তি(প্রয়োগ করা হবে।'' এই নতুন আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় গান্ধিকে। সরকারি প্রতিহিংসার ফলে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে না, এই রকম পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে সাধারণ নির্দেশাবলী' অনুসরণ করে নিজে নিজে কাজ করার পরামর্শ দেয়।

১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে ঐতিহাসিক বৈঠকে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে গান্ধির ভাষণে এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ ''আমি এই মুহূর্তেই ভোর ফুটে ওঠার আগে এই রাত্রিতেই স্বাধীনতা চাই। পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনও কিছু আমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। আমি এখানে আপনাদের সং(প্ত এক মন্ত্র দিচ্ছি। এই মন্ত্র আপনাদের হৃদয়ে গেঁথে থাক ও প্রতিটি নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে আপনারা সেটিকে প্রকাশ ক(ন। এই মন্ত্র হল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। (Do or die) ''আমরা ভারতকে স্বাধীন করব অথবা স্বাধীন করার প্রয়াসে মৃত্যু বরণ করব। দাস হয়ে আমরা জীবন কাটিয়ে দেব না। ''ভারত ছাড়ো' আন্দোলন স্পষ্টতই ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবে এক নুতন পরিবর্তন আনে। গান্ধি ব্রিটিশদের পূর্ণ ও তাৎ(ণিক অপসারণের দাবি জানান। এই দাবি না মানা হলে গান্ধি তাঁর 'অহিংস বিদ্রোহ' সূচনা করার কথা ঘোষণা করেন। এই 'বিদ্রোহের' মূল ল(্য ছিল ''মানুষকে এমন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন কতখানি, তা দেখানোও এর এক উদ্দেশ্য ছিল।''

তখনই ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে কংগ্রেস এইভাবে এক অহিংস গণ আন্দোলনকে অনুমোদন দেয়। এই আন্দোলনের অবশ্য ব্রিটিশদের সরাসরি বিদায় ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের হাতে (মতা হস্তান্তর করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে গান্ধির হাতে ছেড়ে দেয় এবং দেশবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর নির্দেশগুলি মেনে চলার আহ্বান জানায়। গান্ধি এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য শেষ সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকা সরকার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শু(করে।

এইভাবে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়। পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট সকালে গান্ধি, নেহ(, প্যাটেল, আজাদ এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া আইনে গ্রেফতার করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সর্বত্র কংগ্রেসের সমস্ত শাখাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গান্ধির 'হরিজন' সমেত সমস্ত সংবাদপত্রও পত্রপত্রিকার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সবতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেসের জেলা স্তরের নেতাদেরও গ্রেফতার করা হয়। এইভাবে নেতৃহীন হয়ে পড়লেও জনগণ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে।

নেতাদের বন্দি করার খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সব জায়গাতে স্বতস্ফূর্তভাবে হরতাল, সভা, মিছিলের আয়োজন করা হয়। ১১ই আগস্ট থেকে আন্দোলনকারীদের উপর বলপ্রয়োগ করতে শু(করে। আন্দোলন হিংসাত্মক আবার গ্রহণ করলে পুলিশ বি(োভকারীদের উপরে লাঠিচার্জ করে, এমন কী গুলিও চালায়। যে সব এলাকাতে কংগ্রেসের প্রভাব বেশি বা যেখানে যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকটের ফলে মানুষের চরম দুর্দশা, সেই সব জায়গাগুলির সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়। শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের উপরে পুলিশী অত্যাচারের ফল উল্টো হয়। বি(োভ ও মিছিলে ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মরিয়া হয়ে পুলিশ আরও বেশি করে মানুষকে গ্রেফতার করতে থাকে এবং লাঠি ও গুলির আশ্রয় নিতে থাকে। বিহার, বোম্বাই, সংযুক্ত(প্রদেশ, খণ্ড প্রবেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের বিস্তৃত অঞ্চল অফিস বা ডাকঘর ও রেল স্টেশন ইত্যাদি আত্র(মণ করে।

বিক্ষোভকারীরা ডাক ও তার যোগাযোগ, রেল লাইন এবং সরকারি অফিসগুলি ধ্বংস করে দেয়। সমগ্র ভারত জুড়ে শ'য়ে শ'য়ে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায় এবং জনজীবন একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আন্দোলনের মূল কেন্দ্রগুলি হয় বিহার, সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক। এই সব অঞ্চলে এই আন্দোলন এক গণ বিদ্রোহের চেহারা নেয়।

ত্রিশের দশকে যেখানে কিষান সভার প্রধান ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ও যেখানে কিসান সভার অধিকাংশ কর্মী কম্যুনিস্টদেরও সহজানন্দের যুদ্ধ সমর্থন করা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সেই বিহারেই এই আন্দোলনের সব থেকে বেশি প্রভাব পড়ে। গয়া ছাড়া সমস্ত জেলা থেকে পাটনা বিচ্ছিন হয়ে পড়ে (বিমান যোগাযোগ ব্যতীত) এবং উত্তর ও মধ্য বিহারের দশটি জেলার আশি শতাংশ থানা বিক্ষোভকারীদের দখলে চলে আসে বা সাময়িকভাবে ফাঁকা করে দেওয়া হয়। বহু আদিবাসীও এই আন্দোলনে অংশ নেয়, কারণ কংগ্রেসের সূত্র অনুযায়ী হাজারিবাগ জেলাতেই সব থেকে বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে—১৭৬১ জনের মধ্যে ৫৩৩ জন। এর পরেই আসে সারণ—৫১৭ এবং ভাগলপুর—৪৪৭। বিদ্রোহের এই স্রোত দ্রুত ভোজপুরি-ভাষী পশ্চিম-বিহার থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকে সমমনস্ক সংযুক্ত প্রদেশের বারাণসী বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। বালিয়াতে দশটি থানার সবকটি দখল করে নেওয়া হয় এবং অল্প সময়ের জন্য এখানে ও নিকটবর্তী গাজীপুরে জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। বালিয়াতে সরকারের নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় কংগ্রেস নেতা চিতু পান্ডে। ১৫-১৭ আগস্ট আজমগড়ে মধুবন থানা অবরোধের এক চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় নিবলাটের রচনায় ঃ ''শুধু লাঠি বা বল্লম নয়, লাঙল, হাতুড়ি, করাত, কোদাল ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে পাঁচ হাজার মানুষ থানার দিকে এগোতে থাকে.... দূর থেকে তাদের লাঠি ও বল্লমগুলি দেখে মনে হতে থাকে যেন এক চলমান জঙ্গল এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে।''

সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করে সব থেকে বেশি প্রভাবিত ষোলটি জেলাতে বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। অবশ্য ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ওই সব অঞ্চলে গেরিলা পদ্ধতিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে থাকে, যেগুলির পিছনে থাকে জয় প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বাধীন নেপাল সীমান্তভিত্তিক অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে এক ধরনের শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ স্থানীয় সমান্তরাল সরকারগুলি।

বিদ্রোহী 'জাতীয় সরকারের' এক অতি উত্তম বিবরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা থেকে। বর্ণনাকারেরা হলেন তমলুক জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্তের মতো কংগ্রেস নেতারা। তমলুক ও প্রতিবেশী কাঁথি মহকুমা দীর্ঘদিন ধরে গান্ধিবাদী চিন্তার পীঠস্থান বলে পরিচিত ছিল এবং দুটি অঞ্চলেরই স্থায়ী গঠনমূলক কাজ করার ঐতিহ্য ছিল। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের মতো ১৯৪২ সালে এখানে সেরকম হিংসাত্মক আন্দোলন হয়নি— কিন্তু এখানে আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সুসংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী। এছাড়া বিশেষ কিছু পরিস্থিতির (নৌকা ও সাইকেল ধ্বংস করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা, ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের ভয়াবহ সাইক্লোনের বা ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণের ব্যবস্থা করা, পরের বছরের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) ফলে কিছু সম্পূর্ণ নতুন আর্থিক নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

৮ই আগস্ট ভারত সরকার এক প্রস্তাবে অভিযোগ আনে যে কংগ্রেস 'বেআইনি, বিপজনক ও হিংসাত্মক কাজের' মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনহিতকর ব্যবস্থাগুলিকে বিপর্যস্ত করতে চাইছে। এ ছাড়া আরও অভিযোগ করা হয় যে কংগ্রেস ধর্মঘট সংগঠিত করছে, সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। রবিবার, ৯ই আগস্টের সকালে সরকার এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পুলিশবাহিনী বোম্বাইতে বিড়লা হাউসে চড়াও হয় যেখানে তখন গান্ধি ও

তাঁর সঙ্গীরা বাস করছিলেন। পত্নী বাস্তরবা, সচিব মহাদেও দেশাই ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে গান্ধিকে গ্রেফতার করে সবাইকে পুনার আগা খান প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয়। একই সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যকে আহমেদনগরের 'ওল্ড ফোর্টে' নিয়ে যাওয়া হয়। সারা ভারত জুড়ে ধরপাকড় চালানো হয় এবং সব স্তরের কংগ্রেস নেতাদের নির্বিচারে জেলে পোরা হয়।

১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বাংলার তমলুকে বিদ্রোহীরা 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' নামে এক সমান্তরাল সরকার গঠন করে। সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুক— প্রতিটি থানাতেই জনগণ তাঁদের নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তমলুক নন্দীগ্রাম ও মহিষাদলে বিদ্যুৎ বাহিনী বা জাতীয় সেনা দল গঠন করা হয়। কংগ্রেস কমিটি সতীশ চন্দ্র সামন্তকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক বা পরিচালক হিসাবে মনোনীত করে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীল খাড়া। গান্ধি মুক্তি(পাবার পর আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন, তার পরিপ্রেি(তে ১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই 'জাতীয় সরকার' ভেঙে দেওয়া হয়। তমলুকের এই জাতীয় সরকার এক সশস্ত্র বিদ্যুৎ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন স্তরে আদালত স্থাপন করে ১৬৮১ টি মামলার মীমাংসা করে। বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য করে, উনআশি হাজার টাকার ত্রাণ বিতরণ করে ও সব থেকে বড় কথা, ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত ধান দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। ধনী জোতদার ও মুনাফাকারীদের এই সরকার শোষণমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার নোটিশ দেয় এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ ও শস্য সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে।

কলকাতার ছাত্রসমাজ স্কুল ও কলেজে না গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। কলকাতার বহু অঞ্চলে পুলিশ গুলি চালায় এবং ২৩ থেকে ২৫শে আগস্টের মধ্যে কলকাতাতেই ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। সংবাদ মাধ্যমের উপর দমননীতির প্রতিবাদে অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্ট্যান্ডার্ডের মতো বেশ কিছু সংবাদপত্র দশদিনের জন্য প্রকাশনা স্থাগিত রাখে। দেশ জুড়ে গণ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের কাজকর্মও বেড়ে উঠতে থাকে। জয় প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, অরুণা আসফ আলি, রামহমনোহর লোহিয়া ও উষা মেহতার মতো সমাজতন্ত্রী নেতারা সামনে থেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি' যুগান্তর', 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি' ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতেই হবে। সামরিক বাহিনী ও ঘোড়সওয়ার পুলিশের আগমনে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে— গ্রামের পর গ্রামে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা চলতে থাকে। সংযুক্ত(প্রদেশে, বিশেষত বালিয়া, আজমগড়, গাজীপুর, মির্জাপুর, সুলতানপুর, জৌনপুর ও গোর(পুরে পরিস্থিতি গুরুতর মোড় নেয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের উপস্থিতিতে বিহারে বিপ্লবীদের কাজকর্ম এক নতুন মাত্রা পায়। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং সেখানে বিপ্লবীদের প্রশি(ণের ব্যবস্থা করেন।

মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় কংগ্রেস নুনের ডিপোগুলি লুঠ করে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে, গ্রাম স্বরাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খাদ্যভাণ্ডারকে আগলে রাখে। এরাম-বাসুদেবপুর থানায় গণ আক্র(মণের ফলে পঁয়ত্রিশ জন প্রাণ হারান (২৮শে সেপ্টেম্বর) ও গুরুপাল অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য এক 'জাতীয় সরকার' কাজ করে। আর এক ঝটিকা কেন্দ্র কটকে অবশ্য গণ আন্দোলনের থেকে স্থানীয় রক্ষ(বাহিনীর সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আদিবাসী অধ্যুষিত কোরাপুট অঞ্চলে মানুষ জেপুরের সংরি(ত বনাঞ্চলে জমিদারদের বি(দ্ধে ভাড়া না দেওয়ার ব্যাপক আন্দোলন শুরু(করে এবং থানাগুলির উপর আক্র(মণ চালায়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন লক্ষ্মণ নায়েক নামে এক নির(র গ্রামবাসী, যাকে এক বনরক্ষীকে হত্যার অভিযোগে ১৬ই নভেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয়। তালচের রাজ্যে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত গেরিলা কার্যকলাপ চলতে থাকে। সেখানে এক চাষি-মৌলিয়া (কৃষক-শ্রমিক) রাজ প্রায় চারশো বর্গমাইল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং ১৯৪২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তালচের শহর আক্র(মণ করে, যা প্রতিরোধ করতে বিমান বাহিনীর সাহায্যে নিতে হয়। এর

আগে তালচেরে বেথি বা বাধ্যতামূলক শ্রম, অরণ্য আইন ও স্বৈরাচারী শাসনের বি(দ্ধে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এই বারের আন্দোলনের তাৎ(ণিক কারণ ছিল রাজ্য প্রজামণ্ডলের সভাপতি পবিত্রমোহন প্রধানের খুন হয়ে যাবার গুজব।

নগরাঞ্চলে প্রাথমিক আন্দোলনকে দমন করার পর তা বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দুটি স্পষ্ট চেহারা নেয় ঃ কয়েকটি অঞ্চলে কৃষক ও গেরিলা আন্দোলন এবং শি(িত কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাসমূলক ও আত্মঘাতী কাজকর্ম, যার পিছনে অবশ্যই ছিল জনসমর্থন। কৃষক বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসে মহারাষ্ট্রের পূর্ব খণ্ডেশ ও সাতারা এবং গুজরাতের ব্রোচ জেলার জয়সার তালুক কংগ্রেস ইতিহাসবিদ গোবিন্দ সহায়ের মন্তব্যে সাতারা ও জম্বুসার আন্দোলনের কিছু সামাজিক তাৎপর্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। সাতারাতে স্থানীয় অপরাধীরা নানা পাতিলের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ডাকাতিতে লিপ্ত হয় এবং জম্বুসারেও স্থানীয় ডাকাত মেগজি তিন মাসের জন্য এক মুক্ত(াঞ্চল গঠন করতে সাহায্যে করে। ওই অঞ্চলে অত্যন্ত শক্তি(শালী কৃষক-ভিত্তিক অব্রাহ্মণ 'বাহিয়াজন সমাজ' ঐতিহ্যের সঙ্গে সাতারার আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এখানে কিছুটা দেরিতে, অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সমান্তরাল সরকার গড়ে ওঠে এবং ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত তা নিজের অস্তিত্ব কোনও রকমে বজায় রাখতে স(ম হয়। গেরিলা যুদ্ধ চালানো ছাড়া এক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত(ছিল গণ আদালত (ন্যায়দান মণ্ডল) পরিচালনা করা এবং গান্ধিবাদ অনুসরণে কিছু গঠনমূলক কাজ করা। ১৯৪২ সালে অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও জাতীয়তাবাদী জঙ্গীপনা সামাজিক পরিবর্তনের দিকগুলিকে কিছুটা পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এটা ল(্য করার মতো যে, 'প্রতি সরকার' স্থানীয় ডাকাতদের বি(দ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়— যার মধ্যে দিয়ে তখনও অত্যাচারিত, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারী কৃষকদের দাবীকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এ(ে ত্রে সাতারার পাহাড়ি অঞ্চলে ঘাঁটি করা নিম্নবর্গের ডাকাতদের বি(দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রেসিডেন্সির অন্যান্য স্থানে সমাজতন্ত্রীরা গোপন, সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাতে থাকে, যা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন বোম্বাই শহর থেকে অ(ণা আসফ আলির মতো নেতারা। কর্ণাটকে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উপর ষোলশ বার, ছাব্বিশটি রেল স্টেশন ও বত্রিশটি ডাকঘরের উপর আত্র(মণ চালানো হয়। কিন্তু এই সময়ে কর না দেওয়ার কোনও আন্দোলন হয়নি, যদিও খেড়া ও বারদোই এলাকাতে উচ্চ শ্রেণিভুক্ত(পাতিদার পরিবারগুলির বেশ কিছু ত(ণ সদস্য সন্ত্রাসমূলক কাজে যোগ দেয়। সাধারণভাবে এটা মনে করা যেতে পারে যে, কৃষিতে উন্নত এবং সমৃদ্ধ কৃষকদের গ্রামগুলি ১৯৪২ সালের বিদ্রোহ থেকে নিজেদের দুরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে পাঞ্জাব, সংযুক্ত(প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, গুজরাট তামিলনাড়ুর থানাভুর এলাকার উল্লেখ করা যায়। কৃষক বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে পূর্ব ভারত, যেখানে কৃষকদের অবস্থা স্থির অথবা নিম্নগামী। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী মানুষের অধিকাংশই এসেছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে নীচুতলার স্তরগুলি থেকে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এই আন্দোলন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। চোরাগোপ্তা আন্দোলন ১৯৪৩ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত চললেও প্রকাশ্য আন্দোলন সরকারের চাপে চলতে গেলে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনকে দমন করতে সরকার অত্যন্ত কড়া পদ(েপ গ্রহণ করে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন স্টন চার্চিল ভারতে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে (কাঁথির ভগবানপুরেও) একই সময়ে পরিকল্পিত উপায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও থানাগুলির উপর আত্র(মণ চালানো হয়। সুতাহাটা থানা প্রকৃতপ(ে আন্দোলনকারীরা দখল করে নেয়। অন্যান্য জায়গায় অবশ্য রক্ত(গঙ্গা বয়ে যায় এবং একই দিনে চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হয়। দুই সপ্তাহ পরে তমলুক মহকুমাতে এক ভয়াবহ ঝূর্ণিঝড়ে পঞ্চাশ শতাংশ শস্য ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় চার হাজার মানুষ এবং সত্তর হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়, যথেষ্ট পরিমাণ

সরকারি ত্রাণের অভাবে (সম্ভবত ইচ্ছাকৃত) কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেরাই এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

ভারতের নারীসমাজ এই আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এই আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা, আসমের কনকলতা বড়ুয়া ও ফুকোনানির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাহাত্তর বছর বয়সী কৃষক পরিবারের বিধবা 'মাতঙ্গিনী হাজরার বীরত্ব দৃষ্টান্তমূলক। আগস্ট বিদ্রোহের সময় তিনি তমলুক থানা দখল অভিযানের নেতৃত্ব দেন। নারী সমাজ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক ও আদিবাসী সমাজ (পু(ষ ও নারী) উপনিবেশবাদের বি(দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যার ফলে এই আন্দেলন এক জনমুখী চরিত্র পায়।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে মোটের উপর তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলন (যা শীঘ্রই সরকার দমন করতে সফল হয়) ছিল প্রধানত নগরভিত্তিক, যার বৈশিষ্ট্য ছিল বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, পাটনা, লখ্নৌ, কানপুর, নাগপুর ও আমেদাবাদের মতো শহরগুলিতে হরতাল, ধর্মঘট এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে এই প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু পল্লি অঞ্চলে সরে আসে এবং বারাণসী, পাটনা ও কটক ইত্যাদি কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্রোহী ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং উত্তর ও পশ্চিম বিহার ও সংযুক্ত(প্রদেশের পূর্বাংশে শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরদ্ধে কার্যত এক কৃষক বিদ্রোহের সূচনা করে। বাংলার মেদিনীপুর এবং মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উড়িষ্যার কিছু কিছু অঞ্চল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়, যখন বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি জাতীয় সরকার গড়ে ওঠে যদিও সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

সরকারের নৃশংস দমননীতির মুখে দুর্বল হয়ে পড়া এই আন্দোলন সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি তার দীর্ঘতম ও সব থেকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই পর্যায়ে শি(িত যুবসমাজ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ঘাঁটি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আত্র(মণ চালায়। তাদের এই আত্র(মণ কোনও কোনও সময়ে গোরিলা যুদ্ধের স্তরে উন্নীত হয়, যেমনটি ল(করা যায় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারত-নেপাল সীমান্তে সংগঠিত আন্দোলনের দিকে নজর দিলে। কৃষকদের কিছু কিছু গোষ্ঠী দিনে চাষবাসের কাজ করে রাত্রে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালায়। বিশেষত মেদিনীপুরের তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাতারা ও উড়িষ্যার তালচেরে গোপন সমান্তরাল 'জাতীয় সরকার' কাজ করতে থাকে। যথেষ্ট বীরত্বব্যঞ্জক মনে হলেও এই ধরনের ত্রি(য়াকলাপ অবশ্য ব্রিটিশ শাসকদের মনে কোনও ত্রাস সৃষ্টি করতে বা মিত্রশক্তি(র যুদ্ধ পরিকল্পনার উপর কোনও প্রভাব ফেলতে তেমন সফল হয়নি। দূরবর্তী মেদিনীপুর জেলার এক প্রান্তে গঠিত এই ধরনের 'জাতীয় সরকার' কলকাতাকে তেমন উদ্বিগ্ন করতে বা আরাকানসও আসাম সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়। এই কারণেই 'তমলুক জাতীয় সরকার' ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর আর টিকে থাকতে স(ম হয়নি।

সরকারি পরিসংখ্যান থেকে অভ্যুত্থানের বিস্তৃতি এবং থাকে দমন করতে ব্রিটিশদের চূড়ান্ত অত্যাচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগে ৯১,৮৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ২৪,৪১৬ জনকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি, ১৬,৭৯৬ জনকে সংযুক্ত(প্রদেশ ও ১৬,২০২ জনকে বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়। দু'শো আটটি পুলিশ চৌকি, ৩৩২টি রেল স্টেশন ও ৯৪৫টি ডাকঘর ধ্বংস করা হয় বা (তিগ্রস্ত করা হয় এবং ৬৬৪টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এগুলির মধ্যে বিহারে সব থেকে বেশি (২০৮টির মধ্যে ৭২) পুলিশ চৌকি আত্র(মণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু বোম্বাইতে ৪৪৭টি বোমা বিস্ফোরণের তুলনায় বিহারে মাত্র ৮টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিহারে বেশি সংখ্যক মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ও বোম্বাইতে সংগঠিত সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম প্রাধান্য পায়। পুলিশ বা সেনাবাহিনীর গুলিতে ১০৬০ জনের

(নিঃসন্দেহে প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি) মৃত্যু হয়। তেষট্টি জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয় এবং ২১৬ জন পুলিশের উর্দি পরিত্যাগ করে (শুধু বিহারেই এই সংখ্যা ২০৫)।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এক অন্যতম বৃহৎ অভ্যুত্থান। এই আন্দোলনের প্রসার ও তীব্রতা ছিল অভূতপূর্ব। এই আন্দোলন অহিংসা থাকতে পারেনি। এমনকী প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি প্রকাশ্যে অহিংস থাকলেও মানুষকে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে থানা আত্র(মণ করতে এবং পুলিশ ও সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে দেয়। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে অহিংস রাখা সম্ভব হয়না। মানুষ অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ও খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু সরকার এই আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলে বহু মানুষ মারা যায় বা আহত হয় এবং বহু আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এর ফলে গোপনে আন্দোলন চালানো শু(হয়। বিশেষত জয় প্রকাশ নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বেআইনি বা নিষিদ্ধ কংগ্রেস সংগঠন এই গোপন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়।

মারমুখী জনতা ২৫০টি রেল স্টেশন ৫৫০টি ডাকঘর ও ৩৫০০টি টেলিফোন বা টেলিগ্রোফ যোগাযোগ ধ্বংস করে দেয়। শ'য়ে শ'য়ে থানা ও সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই বিদ্রোহ দমন করতে সরকার সর্বশক্তি(প্রয়োগ করে। সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়। হাজার হাজার আন্দোলনকারীর উপর গুলি চালানো হয়, এমনকী বিমান আত্র(মণ হানা হয়। সেনাবাহিনীর নিয়মিত ব্যাটালিয়নগুলিকে আন্দোলন দমনের কাজে লাগানো হয়। একটি সূত্র অনুযায়ী পুলিশের গুলিতে ১০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ৬০,০০০ মানুষকে বন্দি বা স্থানান্তরিত করা হয়। বহু অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে লুঠতরাজ চালানো হয়, মহিলাদের উপর বলাৎকার করা হয়, পু(ষদের হত্যা করা হয় ও শিশুদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। ডঃ বিধান চন্দ্রের মতে, ''১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভারতে এই রকম ভয়াবহ দমননীতি ল(করা যায়নি।''

ব্রিটিশরা এই পরিস্থিতিকে এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে। ভাইসরয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, ''১৮৫৭ সালের পর এটাই সব থেকে শক্তি(শালী বিদ্রোহ। সামরিক নিরাপত্তার খাতিরে আমরা বি(ের কাছে এর ব্যাপকতা ও তীব্রতার কথা আজ পর্যন্ত গোপন রেখেছি।'' সেই সময়ে একদিকে যেমন সরকারের নৃশংসতা চরমে ওঠে, তেমনি চারদিকে ব্যাপক ভাবে গণ অন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দ(িণের জেলাগুলি ছেড়ে বিহার ও সংযুক্ত(প্রদেশের পূর্ব অংশ বেআইনি কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সংযুক্ত(প্রদেশের বালিয়া জেলা এ(েত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। এখানে মানুষ একজন বন্দির সাহায্য নিয়ে জেলের দরজা খুলে দেয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং কিছু সময়ের জন্য 'পঞ্চায়েত রাজ' প্রতিষ্ঠা করে। বাংলায় মেদিনীপুর জেলা ব্রিটিশ নিয়মকানুন মানতে অস্বীকার করে। তমলুকে প্রশাসন ব্যবস্থা সংকলিত এক 'জাতীয় সরকারের' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জেলাতে পুলিশের বি(দ্ধে ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করতে হিংসাত্মক কাজকর্ম চালানো হতে থাকে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে অশতি ও চিমুরে এই আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব পড়ে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রেনুগুনটা ও বেজওয়াড়ার মধ্যে ১৩০ মাইল দীর্ঘ রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়। বোম্বাইতে মিল ও কারখানাগুলিতে বিশাল ধর্মঘট ডাকা হয়। উত্তর-পশ্চিম বাংলা, পূর্ব ভারত, মাদ্রাজ ও দ(িণ মারাঠা রেলওয়েজের রেলপথের ব্যাপক (তিসাধন করা হয়। উত্তেজিত জনতা সরকারি অফিসগুলি আত্র(মণ করেই (ান্ত হন না, কয়েকজনকে হত্যাও করে।

এর উত্তরে সরকার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চরম নৃশংসতার আশ্রয় নেয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে সরকার নৈতিকতা, মানবিক শিষ্টাচার ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়। লাঠি, গুলি ও মাঝে মাঝে আকাশ থেকে গুলি চালিয়ে জনভাবে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়। পু(ষদের নির্দয়ভাবে মারা হয় ও অমানুষিক অত্যাচারের মুখে ফেলা হয়। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর রাত্রে তাদের ঘুমোতে দেওয়া হয় না। তাদের (ুধার্ত ও তৃষ(ার্ত

রেখে নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। মেয়েদের বিবস্ত্র করা হয় ও ধর্ষণ করা হয়— এমন কী শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয় না। গ্রামে বহু ঘরবাড়ী ভেঙে ফেলা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মানুষদের বিবস্ত্র করে গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রহার করা হয়। বিনা বিচারে বহু মানুষকে কারাগারে নি(েপ করা হয়। যৌথ জরিমানা (collective fine) এক নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং সব থেকে বড় কথা, নির্দয়ভাবে তা আদায় করা হয়। এসবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা, তাদের শি(া দেওয়া এবং সরকারি আইন অমান্য করার সমস্ত চিন্তা তাদের মন থেকে মুছে ফেলা। এই আন্দোলনে ছাত্ররা মুখ্য ভূমিকা নেয়। বহু ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং বহু স্কুল ও কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। আন্দোলন থামাতে পুলিশ প্রায়ই গুলি চালানোর আশ্রয় নেয়।

সরকারি খতিয়ান অনুযায়ী আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১,০২৮ জন অসামরিক মানুষের মৃত্যু হয় ও ৩,১২৫ জন গু(তরভাবে আহত হয়। এই সংখ্যা যে প্রকৃত সংখ্যার মনের কম তা স্পষ্ট হয়ে যায় আমরা দেখি যে আন্দোলন দমন করতে কমপ(ে ৮টি ব্রিটিশ ও ৫৭টি ভারতীয় ব্যাটালিয়নকে ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ৪,০০০ থেকে ১০,০০০।

বোম্বাইয়ে উষা মেহতা ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯৪২ সালে কয়েক মাসের জন্য কংগ্রেস রেডিও থেকে প্রচার চালান। সাতারাতে নানা পাতিল ও তাঁর সঙ্গীরা এক সমান্তরাল সরকার গঠন করেন। রেলের সম্পত্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার মধ্যে কিছু জায়গাকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে 'জনগণের সরকার' প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যটি টের পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রযুক্তি(গত দ(তাও ফুটে ওঠে। কিন্তু এই সব বি(িপ্ত ঘটনাগুলি বাদ দিলে, এই আন্দোলনে আমরা সংহতি ও পরিকল্পনার অভাব দেখতে পাই। এর ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুঙ্গে উঠে এই আন্দোলন শীঘ্রই তার তীব্রতা হারায় এবং প্রকাশ্য থেকে গোপনে চলে যেতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন আবার নতুন করে জেগে উঠবে না, সেই বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার তার বজ্রমুষ্ঠি শিথিল করার ল(্য দেখায় না। এই কারণেই গ্রেফতার করার ২১ মাস পরে, ১৯৪৪ সালের ৪ঠা মে সরকার গান্ধিকে মুক্তি(দেবার আদেশ দেয়।

এখানে আর একটি বিষয় যোগ করা যেতে পারে। ১৯৪২ সালের আগস্ট থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলি সম্ভাব্য সব রকমের সূত্র থেকে সা(্য আদায় করার চেষ্টা করতে থাকে, যাতে এই আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা যায়। এক বছরের মধ্যে সেই সা(্য এত বিপুল আবার ধারণ করে যে তাকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে সরকারটি উইকেড্রেন নামের এক আই.সি.এস. অফিসার এবং সংযুক্ত(প্রদেশ ও বেরারের তদানীন্তন বিচারপতিকে এক রিপোর্ট তৈরী করার নির্দেশ দেয়। সরকারিভাবে 'রিপোর্ট অন দি ডিসটার্বেন্সেস অফ ১৯৪২-এ নামে পরিচিত এই রিপোর্ট ১৯৪৩ সালের ২৯শে নভেম্বর সরকারের কাছে পেশ করা হয়।

ইউকেন্ডেনের নিজের ভাষায়, ''প্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে মোটামুটি বোঝা যায় যে এই দেশের সরকারকে (মতাচ্যুত করার ল(্যে গান্ধি এবং ওয়াকিং কমিটির কার্যসূচিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সামিল হয়... যে সব (ে ত্রে ঘটনাগুলি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না, সে সব (ে ত্রেও পরিস্থিতিই সেগুলির জন্ম দেয় এবং এর জন্য তাদের কম দায়ী করা যায় না।'' ইউকেন্ডেন অবশ্য স্বীকার করেন যে, ''আইনের কাছে অবশ্য এই সব তথ্য গ্রহণযোগ্য হবে না— কাজেই এগুলি থেকে সরকারকে (মতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হবে। কারণ, গান্ধির কিছু ভাষা ও চিঠি এবং কিছু সম্ভাব্য রাজসা(ীর বক্তব্য ছাড়া তেমন কিছু সা(্যপ্রমাণ হাজির করা যাবে না।''

এই আন্দোলনের সূচনা করতে গান্ধির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইউকেন্ডেন বলেন বি(িপ্ত সত্যাগ্রহ

আন্দোলনগুলির ব্যর্থতা, ত্রি(পসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, কংগ্রেসের কর্মীদের মনোবলে চিড় ধরা, মুসলিম লিগের পাকিস্তান সংত্র(ান্ত দাবিকে ব্রিটিশদের সমর্থনের আশঙ্কা এবং বহুসংখ্যক মার্কিন সেনার ভারতে উপস্থিতি তাঁকে এই আন্দোলন শু(করতে বাধ্য করেছিল। ''সবার উপরে ছিল গান্ধির ধারণা যে ব্রিটিশদের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে এই ধারণা না থাকলে এই আন্দোলনের জন্মই হতনা।'' ইউকেন্ডেন যা কিছু ঘটেছে তার জন্য প্রধানত গান্ধিকেই দায়ী করেন। তবুও কংগ্রেস ছাড়াও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য বিপ-বী গোষ্ঠীগুলি এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

সামাজিক পরিপ্রে(িতে এই আন্দোলনের কিছু অংশ বি(ে-ষণ করলে বোঝা যায় যে, এতে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল স্বল্পস্থায়ী ও সীমিত। কলকাতা শিল্পাঞ্চল মোটামুটি শান্ত থাকে এবং এখানে কম্যুনিস্টদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জামসেদপুর ও আমেদাবাদকে বাদ দিলে আহমেদনগর ও পুনার মতো ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকরা যথেষ্ট সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগদান করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই জায়গাগুলিতে কম্যুনিস্ট প্রভাব ছিল স্বল্প এবং গান্ধিবাদের প্রভাবে 'শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক ছিল সৌহার্দমূলক'। এই সব স্থানে 'মিল মালিকরা শ্রমিকদের অনুপস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি।'

এই বিষয়ে কোনও বিস্তারিত সমী(া ধরা না হলেও এ কথা বলা যায় যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বোম্বাইতে এই আন্দোলনে যথেষ্টভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'দি ফ্রিডম স্ট্রাগল ফ্রন্ট' নামের এর নিষিদ্ধ সমাজবাদী ইস্তাহারে বলা হয় যে, পরণের ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করে ধনী মিলমালিক ও ব্যাত্ত(মালিকদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে। ১৯৪২ সালে গোপন জাতীয়তাবাদী কাজকর্মে আড়াল থেকে উচ্চবিত্ত মানুষদের, এমন কী উচ্চপদে সরকারি কর্মীদের সমর্থনের কথাও জানা যায়। এই সমর্থনের সাহায্যে কর্মীরা (সি.পি. আইয়ের কর্মীদের বাদ দিলে যাদের এই ধরনের গোপন কার্যকলাপ চালাবার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না) মোটামুটি কার্যকরী এক বেআইনি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স(ম হয়, যার মধ্যে উল্লখযোগ্য হল উষা মেহতার প্রতিষ্ঠিত এক গোপন রেডিও স্টেশন বা বেতার কেন্দ্র, যা বোম্বাইয়ে তিন মাস কাজ চালাতে সফল হয়। অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে সেভাবে সত্রি(য় না হলেও ১৯৪২ সালে মধ্যবিত্ত ছাত্রসমাজ এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। শহরের মধ্যে সংঘর্ষে, অন্তর্ঘাত ঘটাতে অথবা কৃষক বিদ্রোহকে উৎসাহ যোগাতে তারা সর্বত্র সমানের সারিতে আত্মপ্রকাশ করে। আগস্ট আন্দোলনকে যা প্রকৃত অর্থে শক্তি(শালী করে তোলে তা হল কিছু কিছু অঞ্চলে কৃষকদের ব্যাপক অভ্যুত্থান। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকারি কর্মীরা সবিস্ময়ে ল(করেন যে বিহারের একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল (সারন) এক 'কুখ্যাত অপরাধীদের এলাকাতে' পরিণত হয়েছে অথবা ছাত্ররা 'বিহারের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে থাকা অপরাধীদের ইচ্ছুক সহযোগী হিসাবে আবিষ্কার করেছে।' এক সংখ্যাতাত্ত্বিক বি(ে-ষণে এ কথা বোঝা যায় যে স্বভাবগত অপরাধী বা ছন্নছাড়া গুণ্ডাদের নয়, আগেকার জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানগুলির মতো ১৯৪২ সালের আন্দোলনও কার্যত কৃষকদের আন্দোলন।

১৯৩০-র দশকের শেষ দিকে যে সব দ(িণপন্থী কংগ্রেস নেতারা আরও বেদী করে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার প(ছিলেন এবং মন্ত্রী হিসাবে র(ণশীল নীতি অনুসরণ করতেন, সেই তাঁরাও এখন দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগের গৌরব আত্মসাৎ করতে থাকেন। ১৯৪২ সালে যাঁরা প্রকৃত অর্থেই সংগ্রামে নেমেছিলেন, সেই সমাজতন্ত্রীরাও গৌরবের অংশীদার হন। এই দুই প(রই সমালোচক কম্যুনিস্টরা এদিকে জাতীয়তাবাদী মানুষদের এক বড় অংশের চোখে বি(্বাসঘাতক হয়ে দেখা দেন।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশরা যেমন আলোচনার মাধ্যমে (মতা হস্তান্তর করাই শ্রেয় মনে করতে শু(করে তেমনই ১৯৪২ সালের এই আন্দোলন কংগ্রেসের দ(িণপন্থী অংশটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে

আপসকামী জাতীয়তাবাদী নেতাদের শক্তি(শালী করে তোলে। যতই বীরত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক হোক, ব্রিটিশদের সামরিক শক্তি(র কাছে ১৯৪২ সালের এই অন্দোলনের ব্যর্থতা প্রায় নিশ্চিত ছিল। তবুও এই আন্দোলন দুটি দিক থেকে বামপন্থী বিকল্পকে দুর্বল করে দেয়। প্রথমত, কিষান-সভা বা গান্ধিবাদী কাজকর্মের মাধ্যমে বেশ কয়েক বছর ধরে গড়ে ওঠা কৃষকদের ঘাঁটিগুলি নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে ভেঙে পড়ে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে একদিকে বিহার, সংযুক্ত(প্রদেশের পূর্বাংশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলগুলি ১৯৪৫-৪৬ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়নি, তেমনই যুদ্ধোত্তর ওস্বাধীনতার পরবর্তী যুগে মেদিনীপুর ও হুগলীর গ্রামীণ গান্ধিবাদীরা বাংলার রাজনীতিতে উপে(ত থেকে যান। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব বিভাজন ঘটে যায়। ১৯৪২ সালের আন্দোলন নিয়ে 'বি(্বাসঘাতকতার' অভিযোগও পাল্টা অভিযোগ একদিকে কম্যুনিস্ট এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী ও বসুর অনুগামীদের মধ্যে এক প্রাচীর খাড়া করে, যা এক প্রজন্ম পরেও পুরোপুরি ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি।

এই আন্দোলনের ব্যর্থতার অনেকগুলি কারণ ছিল ঃ (১) সমন্বয়ের অভাব ছিল এই আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক ধরনের শিথিল, বিকেন্দ্রীভূত আন্দোলন। নেতারা গ্রেফতার হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় কম্যান্ড ছিল না। (২) এই আন্দোলনের জন্য কোনও যথার্থ সংগঠন বা কর্মসূচি ছিল না। সংগঠন বলতে মনে করা হত গোপনীয়তা, গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহের ধারণাতে যার কোনও স্থান ছিল না। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তির পর মানুষের কাছে কোনও নতুন কর্মসূচি তুলে ধরা হয়নি। এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ বালিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করেন, যেখানে জনগণ (মতা দখল করলেও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। (৩) এ আন্দোলনের আর একটি দুর্বলতা ছিল প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। (৪) ভারতের মধ্যেই ভিন্ন মতাবলম্বী কিছু গোষ্ঠী আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে। অল্পসংখ্যক জাতীয়তাবাদী অংশকে বাদ দিলে সমগ্র মুসলিম সমাজই মুসলিম লিগের উপদেশকে শিরোধার্য করে। এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে তারা দূরে সরে থাকে। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা প্রকাশ্যে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে ও ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব সাহায্য করে। (৫) পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দমননীতির মুখে এই আন্দোলন ভেঙে পড়ে।

ডঃ বিপান চন্দ্রের মতে ঃ ''জাতীয়বাদী মনোভাব দেশের কত গভীরে পৌঁছেছিল ও দেশের মানুষ কি বিশাল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিল, তা তুলে ধরার মধ্যে এই আন্দোলনের গু(ত্ব লুকিয়ে আছে। ''জনগণের হিংসাত্মক অভ্যুত্থান এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সব রকমের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকার মধ্য দিয়ে বিদেশি শাসকদের বিতাড়িত করার এক দৃঢ় সংকল্প ফুটে ওঠে। বহু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া এবং ভারতীয় জনগণের দ্বারা স্বাধীন সরকার ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেয় যে ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। সমগ্র দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠা, তাদের ব্যক্তি(গত ও সমবেত শৌর্য, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার প্রক্রি(য়াটিকে ত্বরান্বিত করে। এখানেই এই আন্দোলনের তাৎপর্য। একজন ইতিহাসবিদ ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে যথাযথভাবে এক ''স্বতঃস্ফূর্ত বিপ-ব'' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৩.৩ সূত্র-নির্দেশ

১. Hitesh Ranjan Sanyal : ''The Quit India Movement in Medinipur District'' in G. Pandey (ed.) The Indian Nation in 1942, Culcutta, 1988.

২. Francis Hutchins : Spontameous Revolution, the Quit India Movement. N. Delhi, 1971.

৩. Amba Prasad : Indian Revolt of 1982. Delhi, 1958.

৪. Satish Samanta : August Revolution and Two Years National Government in Midnapore. Calcutta,, 1946.

৫. P. N. Chopra (ed.) : Quit India Movement— British Secret Reports, Faridabad, 1976.

৬. Amalendu De : Banglai Bharat Chharo Andolan (Bengali), Kolkata, 2004.

৭. Sumit Sarkar : Modera India. New Delhi, 1982.

৮. Surajan Das : Nationalism and Papular Consciousness : Bengal 1942 in Explovations in History, Kolkata, 2003.

৩.৪ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ভারত ছাড়ো আন্দোলন কি এক স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন, না পরিকল্পিত বিদ্রোহ? জনগণের হিংসাত্মক পথের আশ্রয় নেওয়া কি কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের তাৎপর্য কী?

৩. অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ

'ভারত ছাড়ো' অন্দোলনের দুইজন নেতার নাম কর।

৩.৫ সংক্ষিপ্তসার

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গান্ধিজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের এক নতুন স্বতন্ত্র পর্যায়ের সূচনা করে। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ করে ও গণ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাস্তবে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করার আগেই ব্রিটিশ সরকার আঘাত হানে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট গান্ধি কংগ্রেসের নেতাদের সরকার গ্রেফতার করে ও কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে। এর ফলে স্বতস্ফূর্তভাবে চর্তুদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সরকার শীঘ্রই এই আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হয়।

একক ৪ ❑ ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের দিকে

গঠন ঃ

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ ১৯৪০-এর জন আন্দোলনগুলি ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্র বসু ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব

৪.৩ দেশভাগের পথে এগিয়ে যাওয়া

৪.৪ দেশভাগ ও ইতিহাসবিদরা

৪.৫ সূত্র নির্দেশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ সংি(প্তসার

৪.০ উদ্দেশ্য

(১) ভারতের সীমান্তের বাইরে সুভাষচন্দ্র কী ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করেছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা(

(২) নৌ-বিদ্রোহ ছাড়াও যেসব গণ আন্দোলন ভারত ছাড়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা(

(৩) যে সব ঘটনাজনিত কারণে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয়, সেগুলির গতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককে সেই সব ঘটনা ও আলোচনার উপর গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলি ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ ও পাকিস্তানের জন্মের পথকে প্রশস্ত করে।

৪.২ ১৯৪০-এর গণ আন্দোলনগুলি

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্র বসু ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব

১৯৪২ সালের শেষাশেষি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগুন স্তিমিত হয়ে আসে। ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত নেতাকেই গ্রেফতার করা হয়। ভারতর জাতীয়

আন্দোলন অবশ্য তার সীমান্তের বাইরে এর নতুন মাত্রা লাভ করে। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন সুভাষচন্দ্র বসু, অবিসংবাদিতভাবে ভারতের সর্বকালের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা। বসু কংগ্রেসের সভাপতি থাকলেও নীতি ও কৌশল সম্পর্কে গান্ধির সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয়। শেষে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে এক নতুন দল গঠন করেন। এই দলের নাম হয় 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। বসুর মনে এই ধারণা ত্র(মশ দৃঢ়তর হতে থাকে যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি(পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর বি(্বাস হয় যে, ব্রিটিশদের বি(দ্ধে সমগ্র সশস্ত্র প্রত্য(সংগ্রামের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব এবং এই ল(্যে প্রয়োজনে তিনি বিদেশি শক্তি(গুলির সাহায্য গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যে সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন, দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ ও তার ফলে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাঁর হাতে সেই সুযোগ তুলে দেয়।

গান্ধি ও নেহ(সমেত কংগ্রেস নেতারা এমন কিছু করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, যার ফলে ফ্যাসিবাদের বি(দ্ধে যুদ্ধতর ব্রিটিশদের অপদস্থ হতে হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই সহানুভূতি অটুট থাকে। সুভাষচন্দ্র অবশ্য যারা ভারতকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে, সেই ব্রিটিশদের প্রতি অত উদার ছিলেন না। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধে তিনি জার্মানীর জয় কামনা করতেন কারণ তিনি বি(্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের পরাজয় হলেই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হবে। উপনিবেশবাদের বি(দ্ধে বসুর এই চরম মনোভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপ(ওয়াকিবহাল ছিলেন তারা বসুকে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক মনে করতেন। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ শু(হতেই ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সুভাষ চন্দ্রকে ভারত প্রতির(া আইনে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কারাগারে অনশন শু(করেন ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে কলকাতার গৃহে স্থানান্তরিত করা হয় ও গৃহবন্দি করা হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর এলগিন রোডের গৃহ থেকে তিনি পলায়ন করতে স(ম হন ও কলকাতা ছেড়ে চলে যান। বি(্বের রোমহর্ষক পলায়নের ঘটনাগুলির মধ্যে একে অনায়াসেই স্থান দেওয়া যায়। তিনি মোটরগাড়িতে গোমো যান ও তারপর আফগানিস্তানের দুর্গম-পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে রাশিয়াতে পৌঁছোন। বসুর সামরিক সাহায্যের আবেদন অবশ্য তখন অগ্রাহ্য করা হয়। সোভিয়েত শীর্ষনেতা স্টালিন সেই সময় সম্ভাব্য জার্মান আত্র(মণের মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে জোট বাঁধার পরিকল্পনা করছিলেন। রাশিয়ার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে তিনি জার্মানী যান ও হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ইটালির শাসক মুসোলিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। হিটলার ও মুসোলিনী, দুজনেই বসুকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মান সরকারের সহযোগিতায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি 'আজাদ হিন্দুস্তান' নামে বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। বার্লিন থেকে বসুকে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালাতে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি জার্মানি থেকে মুক্ত(ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে সেনা বাহিনী গঠন করারও অনুমতি লাভ করেন। অ(শক্তি(র নিয়ন্ত্রণে থাকা ইউরোপের ভারতীয়রা তাঁকে 'নেতাজী' আখ্যা দেন এবং তাঁর 'জয় হিন্দ' ডাকের প্রতিধ্বনি তোলেন। জার্মানিতে বসু 'ফ্রি ইন্ডিয়ান লিজন' নামে এক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী গঠিত হয় জার্মানিতে ধৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে।

১৯৪৩ সালের মধ্যেই দূর প্রাচ্য (Far East) জাপানীদের দখলে চলে আসে এবং নেতাজি সেইদিকে মনোনিবেশ করেন। জাপান অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভারতীয় অধিবাসীরা নিজেদের সংগঠিত করতে শু(করেন। এই সংগঠনগুলি ১৯১৫ সালে জাপানে আশ্রয় নেওয়া বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্-বী রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বাধীনে 'ইন্ডয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের' (১৯৪২) মূলকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলির ল(ছিল দ্বিমুখী— একদিকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা, অন্যদিকে যুদ্ধের সংকটের সময়ে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ র(া করা। রাসবিহারী টোকিওতে ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করেন, যেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশরা যে সব

ভারতীয় সৈন্যদের জাপানিদের হাতে তুলে দেয়, তাদের নিয়েই এই বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এই বাহিনীর ল(্য হয় ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত(করা। আজাদ হিন্দ ফৌজ রূপ নেবার আগে ১৯৪২ সালের ২৮-৩০ মার্চ টোকিওতে দ(িণ পূর্ব এশিয়ার জাপান অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভারতীয় সংগঠনগুলির ষোল জন প্রতিনিধি এক বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয়দের নিয়ে মুক্তি(যুদ্ধ শু(করার এটাই সঠিক সময়। ভারতকে 'সম্পূর্ণ স্বাধীন ও কর্তৃত্বমুক্ত(' করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কম্যান্ডের অধীনে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে সামরিক সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বৈঠকে ঠিক করা হয় যে, ''ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিরা দেশের জন্য ভবিষ্যৎ ''সংবিধান রচনা করবেন।''

টোকিও অধিবেশনে রাসবিহারী বোস ও বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (মৃত্যু ১৯৭৯) জাপানিদের সঙ্গে বহুবার আলোচনায় বসেন এবং পরে ১৫ই জুন ব্যাংককে এশিয়ার সব প্রান্ত থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক বৈঠক আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন। সেনা ও অসামরিক ব্যক্তি(দের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে মোট ১২০ জনকে এই বৈঠকে ডাকা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন জাপান, মাঞ্চুকুয়ো, হংকং, সাংহাই, ফিলিপাইনস, জাভা, থাইল্যান্ড, মালয় ও বার্মার ভারতীয় প্রতিনিধিরা। যে সব যুদ্ধবন্দি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করতে ইচ্ছুক, ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে তাদের ষাট জনের এক প্রতিনিধিদল বৈঠকে যোগ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল এ.সি. চ্যাটার্জি, কর্নেল এন. এস. গিল, হাবিব-উল-রহমান, গুলাম কাদির গিলানী, করহানুদ্দিন এবং প্রকাশ রাম স্বরূপ। সেখানে রাসবিহারী বোস সর্বসম্মতিত্র(মে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এবং ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করা হয়। লিগ ঘোষণা করে যে অবিলম্বে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা তার প্রধান ল(্য।

এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এক বার্তাও পাঠানো হয়। ১৬-২২ জুন অনুষ্ঠিত ব্যাংকক অধিবেশনে পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেগুলিকে অধিবেশনের শেষ দিন জাপানি কর্তৃপ(ের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কোনও আনুষ্ঠানিক উত্তর না পাওয়া গেলেও ১০ই জুলাই রাসবিহারীকে লেখা এক পত্রে অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি ও জাপানীদের উত্তরকে গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে এটি উল্লেখের দাবি রাখে ঃ ''প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে যে ভারতের স্বাধীনতার ল(্যে সমারিক দায়িত্ব পালনের জন্য ভারতীয় সৈন্য (যুযুধান ও অ-যুযুধান) ও অসামরিক ব্যক্তি(দের মধ্য থেকে নিয়োগ করে অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি নামে এক বাহিনী গঠনের প্রক্রি(য়া শু(করতে হবে।'' এই বাহিনীর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ব্যাংককের ওয়ারলেস রোডে এবং কাউন্সিল অফ অ্যাকশনের পাঁচ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জন্ম হয় ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তার সৈন্য সংখ্যা সতের হাজারে পৌঁছে যায়।

মালয়ে পঁচাশি হাজার বন্দির মধ্যে ষাট হাজার জন ছিলেন ভারতীয়। শেষ সৈন্যটি অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বি(্বাসী জাপানিরা সচরাচর আত্মসমর্পণ করত না এবং যুদ্ধবন্দিদের ঘৃণার চোখে দেখত। এর ফলে তারা যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। কিন্তু ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের কাজে লাগাতে জাপানিরা তাদের ব্রিটিশ অফিসারদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিত এবং তাদের সহযোগিতা আদায়ের জন্য নানা প্রলোভন দিত। তাদের বলা হত যে যুদ্ধের অবসান হয়েছে ও ব্রিটিশরা পরাজিত হয়েছে। তাদের কাছে জাপানের নেতৃত্বে এক নতুন এশিয়ার ছবি তুলে ধরা হত। ভারতীয় অফিসারদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানো হত। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় ক্যাভালরি বা অ(্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন পি কে ধারগালকারের কথা উল্লেখ করা যায়। টানা অষ্টআশি দিন ধরে তাকে পাঁচ থেকে ছয় ফুট লম্বা ও চওড়া এক খাঁচায় রাখা হয়েছিল— মাঝে মাঝে আরও তিন বন্দির সঙ্গেও। ক্যাপ্টেন অবশ্য

আত্মসমর্পণ করেননি এবং পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির বি(দ্ধে সা(াত দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত হন। কিন্তু ধারগালকারের মত ব্যক্তি(রা ব্যতিত্র(ম ছিলেন মাত্র। সাধারণ সৈন্যেরা হাজারে হাজারে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিল।

লিগের ধর্মীয় আঞ্চলিক কমিটি ও জাপানি সামরিক কর্তৃপ(র এক সংঘর্ষের ফলে ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এক গু(তর সমস্যার সম্মুখীন হয়। মোহন সিং সন্দেহ করেন যে জাপানিদের কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। এই সংকটের ফলে লিগের কাউন্সিল অফ অ্যাকশন একজোট হয়ে পদত্যাগ করে। কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু রাসবিহারী বোস লিগের নেতৃত্বে বহাল থাকেন। এই সংকট লিগের উপর এক বিরাট আঘাত হানে।

তিন-চার মাস ধরে বিপজ্জনক ভাবে ডুবোজাহাজে ভ্রমণ করে নেতাজি টোকিও পৌঁছন। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে তিনি জাপানের একনায়ক তোজোর সঙ্গে সা(াৎ করেন। তোজো নেতাজিকে বলেন যে যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছোলে তাঁকে নায়কোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাসবিহারী বোস উদারচিত্তে নেতাজিকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদটি অর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ২৫শে আগস্ট নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে থাকেন ও ফৌজকে পুর্নগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানের দখলে চলে আসে এবং তাদের নতুন নাম হয় যথাত্র(মে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির ধারণাটি প্রথমে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির এক ভারতীয় অফিসার মোহন সিং-এর মাথায় আসে। সেই সময় তিনি মালয়ে ছিলেন। তিনি জাপানিদের পক্ষে যোগ দেন ও তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জাপানিরা ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তাঁর হাতে তুলে দেয় যাতে তারা পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে যুদ্ধে নামতে পারে। ১৯৪২ সাল শেষ হবার আগেই চল্লিশ হাজার মানুষ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। 'ওই পর্যায়ে শুধুমাত্র ভারতীয় জাতীয় অংগ্রেসের আহ্বান পেলেই তারা ব্রিটিশদের বি(দ্ধে নামতে প্রস্তুত ছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে আরও উজ্জীবিত ক'রে তোলে।

কিন্তু জাপানিরা দু'হাজারের বেশি সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করতে অসম্মতি জানায়। এর ফলে মোহন সিং-এর সঙ্গে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয় ও তিনি গ্রেফতার হবার মুখোমুখি হন।

সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব গ্রহণের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের কোনও বাসনা তাদের নেই, জাপানিরা তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলে বসু ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে পুর্নগঠন করার কাজে নেমে পড়েন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট পরে মিত্রশক্তি(র বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শীঘ্রই জাপান ও আটটি অন্যান্য দেশ এই সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সরকার আজাদ হিন্দ সরকার নামেও পরিচিত হয়।

বসু রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে ফৌজের দুটি প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে ফৌজে যোগদান করতে আহ্বান জানানো হয় এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, 'রানী ঝাঁসি' রেজিমেন্ট গঠিত হয় শুধু মহিলাদের নিয়ে। এই রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমতী স্বামীনাথন। ফৌজের অন্যান্য সেনাধ্য(দের মধ্যে ছিলেন শাহনওয়াজ খান, জি. এস ধীলন এবং পি.কে. সাহগল। ১৯৪৪ সালে 'দিল্লি চলো' ডাক দিয়ে ফৌজ কাজে নেমে পড়ে। ওই বছরের মে মাসে সুভাষ ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ ভারতের এলাকায়

ঢুকে পড়ে। এই ব্রিগেডের মূল অংশটি নাগাল্যান্ডের কোহিমাতে পৌঁছোয়। মূল পরিকল্পনা ছিল ইম্ফল অধিকার করতে জাপানিদের সহায়তা করার পর ব্রহ্মপুত্র নদ বরাবর বাংলার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। পরে যুদ্ধের চাকা জাপানিদের বি(দ্ধে ঘুরে যায়। জাপান তার বিমান বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সীমান্তে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। বিমান বাহিনীর সহায়তা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজ দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় যখন বর্ষা আগে চলে আসার ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং সেনাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য পাঠানো অনিয়মিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থাতে ফৌজের প(ে আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যুদ্ধ, রোগ, দলত্যাগ ও জাপানিদের সহযোগিতার অভাব ফৌজের শক্তি((য় ঘটায়। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রিটিশ বাহিনী রেঙ্গুন অধিকার করে এবং ফৌজের কুড়ি হাজার সৈন্য উপবাসী ও হতোদ্যম অবস্থায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সৈন্যদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে বসুর প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এর আগে তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে চৌকিও গমন করেন— কিন্তু সেই চেষ্টাও অসফল হয়। বার্মাতে ব্রিটিশদের জয়লাভের পর বহু সৈন্য ফৌজ ছেড়ে চলে যেতে থাকে। এর ফলে ফৌজ ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই নেতাজি সিঙ্গাপুরে পালিয়ে যান। পরে জাপানিরা জানায় যে ১৯৪৫ সালে আগস্ট টৌকিও যাবার পথে তাইওয়ানের কাছে এক বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজির মৃত্যু হয়। বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ আছে যার আজও কোনও মীমাংসা হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানকে কোনও অবস্থাতেই ছোট করে দেখা যায় না। যুদ্ধ চলাকালীন তারা ভারতীয় সীমান্তের প্রায় দেড়শো মাইল ভিতরে ঢুকে পড়তে স(ম হয়। শাহনওয়াজ খান লেখেন, ''সংখ্যা ও উপকরণের দিক থেকে শত্রুপ(অনেক বেশি শক্তি(শালী হলেও তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিকৃত একটি ঘাঁটিও অধিকার করতে পারেনি।'' মাতৃভূমিকে মুক্ত(করার ল(্যে চার হাজার বীর ভারতীয় সৈন্য মৃত্যু বরণ করে। দিল্লির লালকেল্লায় ফৌজের বিচার দেশে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে উৎসাহ যোগায়। নেহ(সমেত সব জাতীয়তাবাদী নেতারা ফৌজের সাহসী সৈন্যদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি জানান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ ফৌজ এক গৌরবময় অধ্যায়। ফৌজকে ব্যর্থ বলা যায় না। বরং সফল বলা চলে। সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রয়াস ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে তোলে। এরা অন্যদের প্রেরণা দিয়ে অভিষ্ট ল(্যে পৌঁছোতে সহায়তা করে। শৌর্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে। অ(শক্তি(ও তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া বসুর প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টকে এক নতুন, মুক্ত(ভারতের অগ্রদূত বলা যেতেই পারে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব ঃ ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ— কোনওটিই ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশদের তাড়াতে পারেনি। কিন্তু সেই ব্যর্থতাগুলি ছিল নিতান্তই তাৎ(ণিক। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কথা বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে এদের ফলেই আরও বেশি করে গণ আন্দোলনের জন্ম দেয়। প্রকৃতপ(যে কোনও বিপ-বী আন্দোলনই এক সম্মুখগামী পদ(প ও পরবর্তী পদ(পের এক প্রস্তুতি। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হওয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা মুক্তি(পান এবং ভারতের মানুষ তখন সংগ্রামের উপান্ত্য পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত। নীচুতলার চাপের কথা স্বীকার না করে কোনও ভাবেই ব্রিটিশ ও ভারতীয়, দুপ(র নেতাদের সিদ্ধান্তগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। কাজেই এ কথা বলা সঙ্গত যে, যুদ্ধোত্তর গণ অভ্যুত্থান বা 'নীচুতলার চাপ' বহু ভাবে আলোচনা ও আপসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও দেশভাগকে ত্বরান্বিত করে।

দিল্লির লালকেল্লায় সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচার শু(করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে শাহনওয়াজ, স্বীলন ও প্রেম সাহগলকে আদালতে আনা হয়। ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সশ্রু ও নেহ(

অভিযুক্ত(দের পে(দাঁড়ান। অভিযুক্ত(দের বি(দ্ধে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের শপথ লঙঘন করে 'বি(্রোস ঘাতকতা' করার অভিযোগ আনা হয়। সারা দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে এই বিচারের গতিপ্রকৃতি ল(করতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজাদহিন্দ ফৌজকে সমর্থন করে ও ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার অবশ্য এই ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকাকে তেমন গু(ত্ব দিতে রাজি নন। তিনি কংগ্রেসের এই ভূমিকাকে ''জনগণের মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আসলে এক নির্বাচনী প্রচার'' ছাড়া আর কিছু মনে করেননি। সে যাই হোক, জনগণের প্রতিবাদ কিন্তু দেশের সর্বত্র দৃশ্যমান হতে থাকে। স্কুল, কলেজ, অফিস, কারখানা— দেশ জুড়ে সর্বত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বর এই বিষয় নিয়ে কলকাতায় ঘন ঘন বি(োভ সংগঠিত করা হয়। কলকাতার ছাত্রসমাজ বিপুল সংখ্যায় এই সব বি(োভে অংশগ্রহণ করে। বহু (ে ত্রে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে পুলিশ গুলি চালায়। প্রথম বার পুলিশের গুলিতে দুজন ছাত্রের মৃত্যু হলে ২২ শে ও ২৩ শে নভেম্বর সারা শহরে বি(োভ ছড়িয়ে পড়ে। শিখ ট্যাক্সিচালক, কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন ট্রামকর্মী, কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়। গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়, ট্রেন আটকানো হয় এবং পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশের রিপোর্টে পরে বলা হয় যে, ''বি(োভকারীদের উপর গুলি চালানো হলেও তারা সরে যেতে অস্বীকার করে অথবা সামান্য পিছু হটে আবার আত্র(মণ করতে ফিরে আসে।'' পুলিশ চোদ্দবার গুলি চালায় যার ফলে তেত্রিশ জনের মৃত্যু হয় ও প্রায় দুশো জন আহত হয়। এর পরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

১১-১৩ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের আর এক অফিসার রশিদ আলির বিচারের সময় কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহর আবার অস্থির হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই বি(োভে অংশগ্রহণ করেন। বি(োভকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে বেশ কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যু হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে দেশে বি(োভ ও ধর্মঘটের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক শ্রেণির বি(োভের প্রভাব পড়েনি, এমন কোনও কারখানার খোঁজ মেলা কঠিন হয়ে ওঠে। এমনকী ভারতীয় বিমান বাহিনী, পুলিশ, ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের মধ্যেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ প্রকাশ পায় ১৯৪৫ সালের নৌ-বিদ্রোহের রূপ নিয়ে।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মেটাতে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিকে আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী নিয়োগ করার অভিযান শু(হয়। এর ফলে শি(িত মধ্যবিত্তরা নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন। এই নৌ-বাহিনীতে উপনিবেশবাদ এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। অত্যন্ত নোংরা ধরনের জাতি বৈষম্য এখানকার এক ধারাবাহিক চরিত্র ছিল। নৌবাহিনীর নিম্ন স্তরের ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন, খাদ্য এবং অন্যান্য সব বিষয়ে ভীষণ বৈষম্যমূলক মনোভাবের মুখোমুখি হতে হত। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সময় কর্মসূত্রে আরও বিস্তৃত এক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিতি, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও দেশব্যাপী গণ অভ্যুত্থান নৌ-বাহিনীর উপর প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাই বন্দরে নৌবাহিনীর একটি জাহাজের সাধারণ নাবিকরা খারাপ খাদ্য ও জাতিগত অপমানের একটি বি(দ্ধে ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট ত্র(মশ অন্যান্য কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা জাহাজের মাস্তুলে ত্রিবর্ণ পতাকা, ইসলামি প্রতীক চাঁদের ফালির পতাকা ও কাস্তে-হাতুড়ি চিত্রিত পতাকা উত্তোলন করে। বিদ্রোহ শীঘ্রই কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচি ও অন্যান্য বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। নাবিকরা রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি বা ভারতীয় জাতীয় নৌবাহিনী নামে অভিহিত করে এবং ঘোষণা করে যে এর পর তারা শুধুমাত্র ভারতীয় নেতাদের আদেশ মেনে চলবে। এম. এস. খানের নেতৃত্বে 'নাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি' নামে ধর্মঘটিদের এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি পাঁচটি প্রধান দাবি পেশ করে ঃ (১) উত্তম খাদ্য, (২) ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের সমান বেতন, (৩) আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি(, (৪) নৌবাহিনীর ভারতীয়করণ ও (৫) ইন্দোনেশিয়া থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার।

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ও দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন পথটি গ্রহণ করা উচিত হবে সে বিষয়ে বিদ্রোহীরা প্রথমদিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বোম্বাইতে বিদ্রোহী সৈন্যরা কংগ্রেস, লিগ ও কম্যুনিস্ট পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বি(োভ দেখায়। কুড়ি হাজারের বেশি নাবিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা বোম্বাইয়ের অস্ত্রাগার লুঠ করে। অ্যাডমিরাল গডফ্রে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। তিনি নৌ বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেন। নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও মারাঠা গোলন্দাজ বাহিনী জাহাজগুলির উপর আত্র(মণ চালাতে অস্বীকার করে। সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের সমর্থন জানায়। মানুষ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে নাবিকদের জন্য খাবর নিয়ে আসতে থাকে এবং দোকানদাররা তাদের যা যা প্রয়োজন সেগুলি তাদের দোকান থেকে নিয়ে যেতে আহ্বান করেন। সুমিত সরকারের মতে, ''ঘটনাগুলিতে ১৯০৫ সালের প্রথম (শ বিপ্-বের সময় ব্ল্যাক সি ফ্লিটে যে বিদ্রোহ দেখা যায়, তারই প্রতিফলন ল(করা যায়।'' এই নৌ বিদ্রোহ এক গণ বিদ্রোহ হয়ে ওঠে যাতে ল(ল(মানুষ যোগ দেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ শক্তি(নাবিকদের উপর গুলি চালালে আন্দোলন এক হিংসাত্মক মোড় নেয়। স্বতস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ব্রিটিশ সেনা ও জনগণের সংঘর্ষে তিনশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং দুহাজার জন আহত হয়।

বিদ্রোহীরা আশা করেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী নেতারা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করবেন। কিন্তু নেহ(,প্যাটেল ও আজাদ নাবিকদের কাজের সমালোচনা করেন। জিন্না, নাবিকদের আত্মসমর্থন করতে বলেন। গান্ধি বলেন যে ব্রিটিশদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতীয় নাবিকরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারতেন। মেন কী কম্যুনিস্ট নেতারাও এই বিদ্রোহের প্রতি তেমন সহানুভূতি দেখাননি। শেষে অ্যাডমিরাল গডফ্রে বার বার গোলাবর্ষণ করে বোম্বাই শহরকে ধ্বংস করে দেবার হুমকি দিলে প্যাটেল নাবিকদের বোঝান ও তারা ১৯৪৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণ করে। তাদের আ(াস দেওয়া হয় যে বিদ্রোহীদের যাতে শাস্তি না হয়, সে বিষয়ে জাতীয় দলগুলি যথাসম্ভব চেষ্টা করবে।

সুমিত সরকার, আর পি দত্তের মত মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ও পন্ডিতরা এই বিদ্রোহকে খুবই তাৎপর্যময় মনে করেন। তাঁদের মতে, এই নৌ বিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। সুমিত সরকার এই বিদ্রোহকে এক তৎপর্যময় ''নীচুতলার চাপ'' হিসাবে দেখেন যা ব্রিটিশদের ভারত থেকে সরে যাওয়ার প্রত্রি(য়াকে ত্বরান্বিত করে। অধ্যাপক সরকার প্রকৃতপ(নৌ বিদ্রোহকে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচেষ্টা থেকেও বেশি গু(ত্বপূর্ণ মনে করেছেন। একজন মার্কসবাদী পণ্ডিত এই বিদ্রোহকে ''প্রায়-বিপ্-ব'' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে অমলেশ ত্রিপাঠীর মত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ এই বিদ্রোহকে ততটা গু(ত্ব দেননি। ত্রিপাঠীর মতে, ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলেই এই বিদ্রোহের প্রতি গণ সমর্থন ছিল সীমিত। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের মত ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ ভারতীয় প্রগতিবাদের পীঠস্থান কলকাতাতেও তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। গ্রামীণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও এই বিদ্রোহের পরিধির বাইরে ছিল।

শ্রমিক ও কৃষক অসন্তোষ

শ্রমিক ও কৃষক অসন্তোষ সেই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের অবসানে ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হলে ভারতে তখন এক চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনার ভাগীদার হল শিল্পে নিযুক্ত(শ্রমিকরা এবং কৃষকরা। এই উত্তেজনা ও অসন্তোষের সূত্র বি(ে-ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে তাদের বীজ লুকিয়ে ছিল যুদ্ধের প্রভাবের মধ্যে। যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি, ছাঁটাই ও মূল্যবৃদ্ধি। এই ঘটনাগুলি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলে।

১৯৪৫ সালে তার মাদ্রাজ অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসকদের অবিলম্বে ভারত

ছেড়ে যেতে বলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনাগুলি কৃষকদের আরও বড় মাপের রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৬ সালে সারা দেশ জুড়ে বহু শিল্প ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ ল(। ১৯৪৫ সালে যেখানে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৮২৫, ১৯৪৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬২৯-তে। শিল্পে নিযুক্ত(শ্রমিক শ্রেণির অস্থিরতা বেশি মাত্রায় প্রকাশ পায় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে।

উপনিবেশবাদী শাসন গোড়া থেকেই প্রায়শ বিভিন্ন ধরনের কৃষক অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রবণতা থেমে থাকেনি। এই সময়ের কৃষক আন্দোলনগুলি বাস্তবে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোতকে আরও শক্তি(শালী করে তোলে। এরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসন এমন এক ভূমি ব্যবস্থায় জন্ম দেয় যা পশ্চাদমুখী। প্রকৃতপ(উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক শোষণ সব থেকে বেশি আঘাত করে কৃষকশ্রেণিকে। হাজার কৃষককে তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করে ভাগ চাষী, বেগার শ্রমিক বা দিন মজুরে রূপান্তরিত করা হয়। এই সময়কার কৃষক আন্দোলনগুলি শুধু সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নয়, একই সঙ্গে উপনিবেশবাদ-বিরোধীও। এগুলির মধ্যে সব থেকে গু(ত্বপূর্ণ আন্দোলনে দেখা দেয় ১৯৪৬ সালে বাংলার এক ব্যাপক অংশ জুড়ে, যা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের নেতৃত্তব দেয় কম্যুনিস্টরা। এই আন্দোলনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষেরা যোগদান করেন। আন্দোলনকারীদের মধ্যে উপজাতীয়দের সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মত। এই আন্দোলন চলাকালীন কৃষকরা অসাধারণ সংহতির পরিচয় দেয় এবং পুলিশ জমিদার চক্রে(র অত্যাচারের বি(দ্ধে সাহসের সঙ্গে (খে দাঁড়ায়। উপনিবেশবাদী নিষ্ঠুর শক্তি(প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে দমন করে। কিন্তু এই তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষক সমাজের উপর এমন এক প্রভাব রেখে যায়, যা সহজে মুছে ফেলা যায় না। এর ফলে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষকদের মুক্তি(ও ভূমি সংস্কারের পথ পরিস্কার হয়। ১৯৪৬ সালেই কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে এক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়, যা তেলেঙ্গানা আন্দোলন নামে পরিচিত। কুড়ি হাজারের বেশি কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং এই আন্দোলন গ্রামীণ তেলেঙ্গানার আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিতে স(ম হয়। এই আন্দোলনে প্রায় দু হাজার কৃষক নিজেদের জীবন বিসর্জন দেন। ১৯৫১ সালে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও তেলেঙ্গানারা মানুষদের কাছে তার স্মৃতি এখনও সজীব।

জাতীয় আন্দোলনগুলির ফলে সরকারি কাজকর্মও ব্যাহত হয়। অবশ্য এ(ত্রে দাবিদাওয়া বা অভিযোগগুলি ছিল অধিকাংশ (ে ত্রেই অর্থনৈতিক। কিন্তু এর আগে সরকারি কর্মচারীদের কোনও ধর্মঘটের নজির ছিল না। ১৯৪৬ সালে ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের এক সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত হয়। একইভাবে দ(িণ ভারতের রেলকর্মীরা ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে হরতাল পালন করেন। খাজনার উচ্চ হারের প্রতিবাদে প্রায়শই কৃষক ধর্মঘট হতে থাকে। যেগুলির প্রত্যেকটিতে মানুষের এক ধরনের জঙ্গী মনোভাব ল(করা যায়। সংযুক্ত(প্রদেশ, বিহার, বাংলা, মহারাষ্ট্র, মালাবার ও হায়দ্রাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। দেশের স্বার্থের কথা ভেবে ছাত্ররা পড়াশোনাকে উপে(া করে বিভিন্ন ধর্মঘট, হরতাল, বি(াভে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতার দাবিতে জাতীয় নেতাদের হাত শক্ত(করতে নেমে পড়ে। এ-কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে সরকার জাতীয় নেতাদের দাবি মেনে না নিলে এই আন্দোলন অচিরেই এক বিপ-বী আন্দোলনে পরিণত হবে।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের এই আন্দোলন দমন করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। (মতা হস্তান্তর করার ল(্যে সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শু(করে। ব্রিটিশরা তাঁদের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছোনোর জন্য বারবার চেষ্টা চালাতে থাকে। লর্ড ওয়াভেলের ডাকা সিমলা অধিবেশন, ভাইসরয় ও ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত(ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের কথাবার্তা এই প্রচেষ্টারই অংশ। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ

সরকার ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত ছাড়তে তারা দৃঢ়-সংকল্প। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তার আগের ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করতে বাধ্য হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর 'জুন প্ল্যান' (১৯৪৭) পেশ করেন যা ভারতীয় নেতারা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শীঘ্রই 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' অনুমোদন করে এবং ভারত ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন হয়।

৪.৩ দেশভাগের দিকে / ভারত বিভাগের পথে

সি. আর. (চত্র(বর্তী রাজাগোপালাচারী) সূত্র ঃ লিগ এ কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতাকে ব্রিটিশরা ত্র(মশ ভারতের স্বাধীনতার এক পূর্বশর্ত হিসাবে দেখতে থাকে। কিছু কংগ্রেস নেতাও এতে যুক্তি(যুক্ত(মনে করেন। সেই ১৯৪৪ সালেই সি. রাজাগোপালাচারী এর যৌক্তি(কতা উপলব্ধি করতে স(ম হন এবং লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা আনার জন্য তাঁর 'সি আর ফরমুর্লা' নামে আভাস সূত্র প্রণয়ন করেন। তিনি দাবি করেন যে তাঁর এই সূত্র গান্ধি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেছেন।

এই সূত্রে পরামর্শ দেওয়া হয় ঃ

(১) মুসলিম লিগের উচিত স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের দাবিকে সমর্থন করা এবং উত্তরণের সময় অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সহায়তা করা।

(২) যুদ্ধের অবসান হলে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের মুসলিম-প্রধান জেলাগুলির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য এক কমিশন গঠন করা উচিত। এই জেলাগুলির মানুষ গণভোটের মাধ্যমে ভারতে থাকা বা না থাকার বিষয়টি নিজেরাই স্থির করবে।

(৩) গণভোটের আগে প্রতিটি দলকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানাতে দিতে হবে।

(৪) বিভাজন অনিবার্য হলে প্রতির(া, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য গু(ত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ((ত্রে দুই সরকারকে পারস্পরিক চুক্তি(তে আবদ্ধ হতে হবে।

(৫) স্রেফ ঐচ্ছিক ও স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে জনগণের স্থানান্তরকে অনুমতি দেওয়া হবে।

(৬) ব্রিটেন ভারতীয় নেতাদের হাতে (মতা হস্তান্তর করলেই এই শর্তগুলি বাধ্যতামূলক হবে।

(৭) মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে গান্ধি ও জিন্না উভয়েই এই শর্তগুলির প্রতি যথাত্র(মে কংগ্রেস ও লিগের অনুমোদন লাভের চেষ্টা করবেন।

এই সূত্রের ভিত্তিতে গান্ধি এক সমঝোতায় পৌঁছতে চাইলে জিন্না তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এই সূত্রে তাঁকে যে পাকিস্তান দেবার কথা বলা হয়, তাকে জিন্না 'বিকলাঙ্গ পোকায় খাওয়া পাকিস্তান বলে বর্ণনা করেন এবং কোন পরিস্থিতিতেই তাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন।

ওয়াভেল প্ল্যান বা পরিকল্পনা ঃ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ইংল্যান্ড যান এবং ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা সম্পর্কে চার্চিলের সঙ্গে আলোচনা করেন। ব্রিটেনে তখন সাধারণ নির্বাচন নিকটবর্তী হওয়ায় লেবার পার্টির মত কনজারভেটিভ বা র(ণশীল পার্টিও এটা দেখাতে ব্যগ্র ছিল যে ভারতে অচলাবস্থা কাটাতে তারাও সমান আগ্রহী। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত মিত্র দেশগুলিও ভারতের সমস্যা সমাধানে বিশেষ আগ্রহী ছিল। এর ফলে ভারতীয়দের কাছে এক নতুন পরিকল্পনা পেশ করা হল, যার নাম ওয়াভেল প্ল্যান।

ওয়াভেল পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয় ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন। এই পরিকল্পনাকে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা হয়। এই পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রে এমন এক সরকার গঠন করা যাতে বর্ণহিন্দু ও মুসলিমরা সমান প্রতিনিধিত্ব পায়। প্রতির(া ছাড়া অন্যান্য সবকটি বিভাগ ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করা হয়। শুধুমাত্র কমান্ডার-ইন-চিফ ও গভর্নর জেনারেলকে ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়। বলা হয় যে, নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৯৩৫ সালের আইনের কাঠামোর ভিতর কাজ করবে। তাঁর সদ্যগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের উপদেশের বি(দ্ধে ভেটো প্রয়োগের (মতাও গভর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয়।

পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করতে সিমলাতে এক অধিবেশন ডাকা হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, শিখ, তফশিলি সম্প্রদায়, ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে সব ভারতীয় নেতাদের এই অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুন এই অধিবেশন কাজ শু(করে। কিন্তু মূলত জিন্নার অযৌক্তি(কতা মনোভাবের দ(ন আলোচনা ভেঙে পড়ে। কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তার প্রতিনিধি হিসাবে একজন মুসলিমকে মনোনীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি একই পথ অনুসরণ করার কথা বলে। কিন্তু জিন্না কাউন্সিলে মুসলিম লিগ ছাড়া অন্য কোনও দলের কোনও মুসলিম প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত(করতে অসম্মতি জানান। জিন্না শুধুমাত্র মুসলিম লিগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস লিগের এই অযৌক্তি(ক দাবি মেনে নিতে রাজি হয়নি। এর ফলে আলোচনা ভেঙে যায় এবং ১৪ই জুলাই ওয়াভেল এই অধিবেশনকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করেন। এই অধিবেশনের ফলে অবশ্য জিন্নার হাত শক্ত(হয়, কারণ ওয়াভেল তাঁকে কার্যত ভেটো প্রয়োগের (মতা দেন যার ফলে অধিবেশন ব্যর্থ হয়।

ক্যাবিনেট মিশন প-্যান ঃ সিমলা অধিবেশনের ব্যর্থতার পর লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে নয়া দিল্লিতে রাজ্যপালদের এক অধিবেশন ডাকেন, যেখানে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে অ্যাটলির নেতৃত্বে লেবার পার্টি র(ণশীলদরে হারিয়ে (মতা দখল করে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেবার সরকার আলোচনার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে ব্রিটেনে ডেকে পাঠায়। সেখান থেকে ফিরেই ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সরকার যথা শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে আগ্রহী।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সাধারণ আসনগুলি ছাড়াও কংগ্রেস বেশ কিছু মুসলিম আসনেও জয়ী হয়। আবার মুসলিম আসনগুলির (ে ত্রে মুসলিম লিগও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। চারশো পঁচানব্বইটি মুসলিম আসনের ৪৪৬টি-ই লিগ দখল করে। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি মাত্র দশটি মুসলিম আসনে জয়লাভ করতে স(ম হয়। শুধু মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লিগ মুসলিম আসনগুলির জয়ী হতে ব্যর্থ হয়। সেখানে খান ভাইদের নেতৃত্বে খুদাই খিদমতগার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর ফলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে, ইউনিয়নিস্টরা কংগ্রেসের সমর্থনে পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা স্থাপন করে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খুদাই খিদমতগার (মতায় আসে এবং মুসলিম লিগ বাংলা ও সিন্ধে মন্ত্রীসভা গঠন করে।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য এক ক্যাবিনেট মিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। প্রেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রি(পস ও এ.ভি. আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত এই কমিশন ওই বছরের ২৩শে মার্চ ভারতে পৌঁছোয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী ভারতীয়নেতাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনার পর এই মিশন ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটানোর জন্য তার পরিকল্পনাগুলি ঘোষণা করে। এতে বলা হয় ঃ

(১) দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত(করে এক যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বা ফেডারাল সরকার গঠন করা হবে। অবশিষ্ট (মতা থাকবে প্রদেশগুলির হাতে।

(২) বিধানমণ্ডলীতে সাম্প্রদায়িকতা সংক্র(ান্ত কোন গু(ত্বপূর্ণ প্র(ে তোলা হলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন প্রতিটি প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

(৩) নিজেদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অভিন্ন ল(্যে পৌঁছোনর জন্য প্রদেশগুলি পছন্দমত গোষ্ঠী গঠন করতে পারে।

(৪) তার বিধানসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিটি প্রদেশ প্রতি দশ বছর অন্তর সংবিধান পরিবর্তনের অধিকার পাবে।

(৫) ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য এক গণ পরিষদ বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি গঠন করা হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি প্রদেশকে নির্দিষ্ট সংখ্যার আসন বরাদ্দ করা হবে। প্রদেশগুলিকে বরাদ্দ করা আসনগুলি আবার তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র তিনটি সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঃ সাধারণ (মুসলিম ও শিখ ছাড়া বাকি সবাই) মুসলিম ও শিখ (শুধুমাত্র পাঞ্জাবে)। গোষ্ঠীর ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে প্রদেশগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা এই গণ পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে।

(৬) (মতা হস্তান্তর সংক্র(ান্ত কিছু বিষয় মীমাংসার জন্য গণ পরিষদ ও যুক্ত(রাজ্যের মধ্যে একটি চুক্তি(করতে হবে। ভারতের অবশ্য কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা থাকবে।

(৭) যত শীঘ্র সম্ভব গু(ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে এক অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

(৮) (মতা হস্তান্তরের পর ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ একাধিপত্য বজায় থাকবে না।

প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লিগ, কংগ্রেস ও শিখরা এই পরিকল্পনাকে মেনে নেয়। পরে গণ পরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা জিন্নার উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে ও তিনি আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন। কংগ্রেস এই পরিষদকে ভারতের সংবিধান রচনার যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কংগ্রেসের এই মনোভাবও জিন্নার প(ে অসহ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণ পরিষদের বৈঠক আয়োজন করা হলে মুসলিম লিগের সদস্যরা ওই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন।

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন নিয়েও সমস্যার উদ্ভব হয়। তফশিলি সম্প্রদায় সমেত হিন্দু ও মুসলিম লিগের সমতার ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের যে প্রস্তাব লর্ড ওয়াভেল পেশ করেন, কংগ্রেস তা বর্জন করে। এদিকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মুসলিম লিগের অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রচেষ্টাও ব্রিটিশদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। ২২শে জুলঅই ওয়াভেল লিগও কংগ্রেসের কাছে তাঁর নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি ১৪ সদস্যের এক জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন, যাতে তফশিলি সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত(করে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হবে ৬ ও মুসলিম লিগের প্রতিনিধি থাকবে পাঁচ জন। কংগ্রেস তাকে বরাদ্দ করা সদস্য সংখ্যার মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদেরও নির্বাচিত করতে পারে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব মেনে নিলেও মুসলিম লিগ কংগ্রেস-লিগ সমতার দাবিতে অনড় থাকে।

এরপর লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত জহরলাল নেহ(কে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর নেতৃত্বে

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার প্রতিবাদে লিগ ১৯৪৬ সালের ১৭ই আগস্ট প্রত্য(সংগ্রামের (Direct Action) ডাক দেয়, যার ফলে সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিতে পরিস্থিতি গু(তর আকার ধারণ করে। লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লিগকে মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত(করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে নিজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই লিগ সরকারে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের পাঁচ জন সদস্য পদত্যাগ করে লিগের সদস্যদের জন্য স্থান করে দেন এবং লিগ ২৫শে অক্টোবর মন্ত্রীসভায় যোগদান করে। কিন্তু মুসলিম লিগের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি(র ফলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা দূরে থাক, লিগের সদস্যরা সরকারের কাজে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের এই আচরণের ফলে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, দাঙ্গা, প্রাণহানি, লুঠতরাজ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে ও পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি হাউস অফ কমন্সে অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করবে। শীঘ্রই লর্ড ওয়াভেলকে ডেকে পাঠানো হয় এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত(করা হয়। তিনি ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসের শেষাশেষি ভারতে পদার্পণ করেন। সব রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ভারতের সমস্যার এমন এক সমাধানের খোঁজে তিনি ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শু(করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ডিত ভারতের ভিত্তিতে লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তিনি দেশভাগের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন যাতে কংগ্রেস ও লিগ সমঝোতায় আগ্রহ দেখায়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে মাউন্টব্যাটেন ব্রিটেন যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশভাগের প্রস্তাবগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি আদায় করা। ভারতে ফিরে এসে দেশভাগের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি আবার লিগ ও কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁরা সম্মতি জ্ঞাপন করলে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তিনি প্রকাশ্যে তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের মুসলিম-প্রধান সিলেট জেলাকে বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয় তারা ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে ইচ্ছুক কিনা। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু-প্রধান জেলাগুলিকেও একই অধিকার দেওয়া হয়। ভারত বা পাকিস্তান—তারা কার অন্তর্ভুক্ত(হতে যায় এটি দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস উভয়েই ভারত বিভাজনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে মেনে নেয়। ব্রিটিশ সরকারও এই পরিকল্পনাতে তার সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং সেই অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭ অনুমোদন করে, যার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এইভাবে আমরা ল(্য করতে পারি যে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লিগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতেই প্রথম দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই অবস্থানে অনড় থাকে যে ভারত এক অখণ্ড ভূভাগ ও তার সব অধিবাসী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত(— শুধুমাত্র ব্রিটিশদের 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) নীতি যাদের পৃথক করে রেখেছে। ব্রিটিশরা রাজনৈতিক ল(্য হিসাবে ভারতীয় জাতিত্বকে স্বীকার করে নিলেও সংবিধান প্রণয়নের ে(ত্রে বিভিন্ন দল একমত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের জন্য সুর(ার উপর গু(ত্ব দেয়।

মহম্মদ আলি জিন্না পরের দিকে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' অনুরাগী হয়ে পড়েন— এমন কী ১৯৪৯ সালেও মুসলিম

জাতীয় চেতনার বিকাশ ছাড়া তাঁকে অন্য কিছু বলতে শোনা যায়নি। প্রদেশ এবং নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির উপজাতীয় (subnational) গোষ্ঠীগুলির জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলেও তা গু(গম্ভীর রাজনৈতিক আলোচনায় কখনও সে রকম গু(ত্ব লাভ করেনি। ভবিষ্যতে ভারত যে অখণ্ড নাও থাকতে পারে তার প্রথম সম্ভাবনার কথা আঁচ করা যায় ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ত্রি(পস্ প্রস্তাবের মধ্যে, যেখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে কিছু কিছু প্রদেশ এই পরিকল্পনার বাইরে থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সত্তাও বেছে নিতে পারে। অবশ্যই ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানালে দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা বন্দি হন এবং দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের রাজনীতি এক জায়গায় থেমে থাকে।

যুদ্ধের পর ব্রিটেনে লেবার সরকার (মতায় এলে ভারত থেকে ব্রিটিশদের সরে যাবার প্রত্রি(য়াটি ত্বরান্বিত হবার ল(ণ দেখা দেয়। ভাইসরয় হিসাবে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে সমতার ভিত্তিতে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তাঁর এই আবেদনে অবশ্য সাড়া মেলেনি। বিকল্প হিসাবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর জন্য সমগ্র ভারত জুড়ে নির্বাচনের ডাক দেওয়া হয়। কংগ্রেস ''সাধারণ'' আসনগুলিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পৃথক মুসলিম আসনের সিংহ ভাগই লিগ দখল করে নেয়। শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসপন্থী 'রেডশার্টস' মুসলিম লীগের প্রার্থীদের হারিয়ে দিতে স(ম হয়।

এখন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত পৃথক পাকিস্তানের দাবিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এদের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত(করার দাবি জানানো হয়। ব্রিটিশরা অবশ্য তখনও পাকিস্তানের দাবিকে ভারতীয় যুক্ত(রাষ্ট্রের কাঠামোতে বেশি সুযোগসুবিধা আদায়ের এক কৌশল বলে মনে করতে থাকে। ওয়াভেল এক গোপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, যাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হয়— যে সরকার স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করবে। জিন্না এই প্রস্তাবে সম্মত না হলে তাঁকে বলা হবে যে তিনি শুধু এমনই এক পাকিস্তান পাবেন যা গঠিত হবে শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি নিয়ে। এর ফলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজিত হবে এবং পাকিস্তান আসামের একটি মাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হাতে পাবে। তখন মনে করা হয় যে এর ফলে জিন্নার ধাপ্পাবাজি প্রকাশ হয়ে পড়বে। ওয়াভেল লেবার সরকারের কাছে সম্ভাব্য যে পরিকল্পনা পেশ করেন, সেটাই শেষে গৃহীত সমাধানের সঙ্গে মিলে যায়। লেবার মন্ত্রীসভা অবশ্য নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এক ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করাকেই শ্রেয় মনে করে।

পাকিস্তানের দাবীতে মুসলিম ভোটদাতাদের সমর্থনে অনুপ্রাণিত হয়ে জিন্না ছয়টি পূর্ণ প্রদেশের দাবি জানান। এদিকে কংগ্রেস শুধুমাত্র এমন এক সংবিধান স্বীকার করতে রাজী হয় যা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা ভারতীয় গণ পরিষদ মতৈক্যের ভিত্তিতে স্থির করবে। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার প্রয়াসে ত্রি(পস্ তাঁর চতুর সূত্রটি পেশ করেন। তার 'ত্রি-স্তর' পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের (মতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেওয়া হয়— প্রদেশ, কেন্দ্র (প্রতির(া, বিদেশনীতি ইত্যাদির জন্য) এবং প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত 'গোষ্ঠী'। প্রথম গোষ্ঠী বা গ্রুপ 'এ'-র অন্তর্ভুক্ত(হয় উপমহাদেশের সিংহভাগ, গ্রুফ 'বি'তে পড়ে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধ এবং গ্রুপ 'সি'-র অন্তর্ভুক্ত(হয় বাংলা ও আসাম। কংগ্রেস ত্রি(পস্ সূত্রকে কাটছাঁট করলেও জিন্না ও মুসলিম লিগ এই সূত্রকে মেনে নিতে রাজি হয়, কারণ তাদের বি(্বাস হয় যে এর ফলে ছয় প্রদেশ-যুক্ত(পাকিস্তান পেতে তাদের সুবিধা হবে। কংগ্রেস পরে এই পরিকল্পনায় তার সম্মতি জানায়। কিন্তু গোষ্ঠী বিভাজনের এই প্রত্রি(য়াকে অপ্রাসঙ্গিক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

১৯৪৬ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লেবার সরকার কংগ্রেসকে এই 'গ্রুপিক্স' বা গোষ্ঠী বিভাজনকে মেনে

নেবার জন্য বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষে জহরলাল নেহ(এটি মেনে নিতে অস্বীকার করলে ব্র(দ্ধ জিন্না ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ''প্রত্য(আন্দোলনের'' ডাক দেন। এর ফলে কলকাতায় ব্যাপক হিংসার সূত্রপাত হয় এবং চার হাজার মানুষের মৃত্যুর পরই কেবল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। এই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙ বা 'কলকাতা নরমেধ' ওয়াভেলকে বুঝিয়ে দেয় যে ভারতের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ত্র(মেই শিথিল হয়ে আসছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাবার একটি চূড়ান্ত দিন ঘোষণা করতে আবেদন জানান। ওয়াভেলকে 'পরাভববাদী' আখ্যা দিলেও অ্যাটলির নিজের কাছেও আর কোনও বিকল্প ছিল না এবং ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে। তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের পদে অভিষিক্ত(হবেন।

অ্যাটলির ঘোষণা অবশ্য ভারতের সমস্যা সমাধানের (ে ত্রে কোনও কাজে আসেনি। কোনও ধরনের মতৈক্যের অনুপস্থিতিতে তিনি মেনে নেন যে ভারতের বিভাজন অনিবার্য। সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বাস্তববাদী নেতারা স্বীকার করে নেন যে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া থেকে পাকিস্তান গঠন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। তাঁরা বরং চেষ্টা করতে থাকেন জিন্নাকে যথাসম্ভব কম অঞ্চল ছাড়ার। মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেন যে, ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ডিত ভারতের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং তাঁর কর্মচারীদের দেশভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন—''যা ভারত ভাগের দায়িত্ব ল(নীয়ভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবে।'' অ্যাটলির ঘোষণা অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে কে ভারতে থাকবে ও কে নতুন রাষ্ট্রে (তখনও পাকিস্তান নাম ব্যবহার করা হয়নি) থাকবে। পাঞ্জাব ও বাংলায় বিধায়করা মুসলিম ও অ-মুসলিম হিসাবে পৃথকভাবে ভোট দেবেন— কোনও সম্প্রদায় বা অংশ প্রদেশ ভাগ করতে চাইলে সেটাই করা হবে।

তাঁদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, নেহ(ও জিন্না এই প্রস্তাবে সেরকমই প্রতিত্রি(য়া জানান। অবশ্য ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন ভারতবাসীদের জানাতে সমর্থ হন যে ভারতীয় নেতারা তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। বিধানসভাগুলিতে ভোট গ্রহণ ছাড়া আসামের সিলেট জেলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হয় তারা পাকিস্তানে থাকবে কি না। বালুচিস্তানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি (ে ত্রেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি পাকিস্তানে যোগদান করতে মনস্থ করে।

বাংলা ও পাঞ্জাব, এই দুই জায়গাতেই প্রকৃত বিভাজন রেখা নির্দিষ্ট করে ব্রিটিশ সভাপতি সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন এক বাউন্ডারি কমিশন, যাতে সমসংখ্যক মুসলিম এবং অ-মুসলিম সদস্যরা প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকে। সব থেকে সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় মধ্য পাঞ্জাব, যেখানে মুসলিম ও হিন্দুদের পৃথক করার ল(্যে যে কোনও বিভাজন রেখা শিখদের জমির ভিতর দিয়ে অতিত্র(ম করে। পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ হলেও শিখরা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল এবং সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল উল্লেখ করার মত।

তাঁর সহকর্মীরা কোনও ভাবেই মতৈক্যে পৌঁছোতে না পারায় র‍্যাডক্লিফ নিজেই দেশভাগের পরিকল্পনাটি স্থির করেন। এতে কিছু কিছু চমক ল(করা যায়। নতুন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম বিহীন চিটাগাং হিল বা চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাকে অন্তর্ভুক্ত(করা হয়, কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলাকে তার বাইরে রাখা হয়। পাঞ্জাবের মুসলিম-প্রধান গু(দাসপুর জেলা সম্পর্কে র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্তে অবশ্য সব থেকে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কা(্মীরের প্রবেশপথ হিসাবেও গু(দাসপুরের গু(ত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না।

১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্ট অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সভাপতি হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রকৃত বিভাজন রেখাটি দুই নতুন দেশের নেতাদের জানিয়ে দেন। এই ভাগাভাগিতে উভয় প(ই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত(হয়। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে

ব্যাপক বহির্গমন শু(হয়— মুসলিমরা পাকিস্তান এবং হিন্দু ও শিখরা ভারতের দিকে রওনা হন। 'চল্লিশ ল(মানুষ পূর্বদিকে পাড়ি দেন, আবার চল্লিশ ল(মানুষ পশ্চিম দিকে যাবার পথে রওনা হন। এই প্রত্রি(য়ায় প্রায় দু ল(মানুষ প্রাণ হারান। বাংলায় জনগণের বিনিময় এবং হিংসাত্মক ঘটনা অতটা মারাত্মক আকার ধারণ না করে বেশ কিছুদিন ধরে চলে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জন্মের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে হিন্দু উচ্ছেদ চলতে থাকে এবং আশির দশক পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর প্রব্রজন চলে।

দেশভাগের কারণগুলির দিকে পিছন ফিরে তাকানো

দেশভাগ ভারতের ইতিহাসের এক অন্যতম গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু যে পদ্ধতি ও পরিস্থিতির মধ্যে এই দেশভাগ অনুষ্ঠিত হয়, তা এই ঘটনাকে ইতিহাসের এক অন্যতম দুঃখজনক ঘটনাতে পরিণত করে। এর এক প্রধান কারণ হল ভারতীয় মুসলিমদের উন্মত্ত ধর্মীয় উদ্দীপনা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব। শতকের পর শতক এক সাথে থাকার পরও মুসলিম ও হিন্দুরা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিমরা দীর্ঘ দিন ধরে ইংরাজি শি(া ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে ও এর ফলে ধর্মীয় উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে আলিগড় আন্দোলনও এক সাম্প্রদায়িক চেহারা নেয়। ত্র(মশ মুসলিমদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা শক্তি(শালী হয়ে উঠতে থাকে যে তাদের স্বার্থ হিন্দুদের থেকে শুধু পৃথক নয়, তারা একে অপরের বিপরীত। স্যার মহম্মদ ইকবাল ও অন্যান্য বহু মুসলিম নেতা এই মনোভাবে ইন্ধন যোগান। তারপর জিন্না ও মুসলিম লিগ এই ধারণাকে একই পতাকার তলে সংগঠিত ও বিকাশিত করে। জিন্নার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মুসলিমদের মনে আশার সঞ্চার করে ও তারা প্রয়োজনে হিংসার সাহায্য নিয়েও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে ব্রিটিশদের সমর্থন দেশভাগের আর একটি কারণ। ব্রিটিশদের সত্রি(য় সমর্থন ছাড়া মুসিলম সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও দেশভাগ— এই দুইয়ের কোনওটাই সম্ভব ছিল না। ১৯৭০ সাল থেকে ব্রিটিশরা মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা শু(করে। আলিগড় আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশরা সত্রি(য় সমর্থন জানায়। ১৯০৯ সালের রিফর্ম অ্যাক্টের অনেক আগেই তারা 'বিভাজন ও শাসন' নীতি চালু করে। ১৯০৯ সালে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা মুসলিমদের ও তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে উৎসাহ দেওয়ার কৌশলের এক অঙ্গ মাত্র। লিগ পাকিস্তান দাবি করার আগেই ব্রিটিশরা একে মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত দাবি হিসাবে মেনে নিয়েছিল। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-কে সত্রি(য়ভাবে সমর্থন করে তারা সাধারণভাবে লিগ ও মুসিলমদের সব রকম সহায়তা করেছিল। এর ফলেই লিগ তার দাবি নিয়ে এমন অনড় মনোভাব প্রকাশ করতে স(ম হয় এবং হিংসার পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধা বোধ করে না। লিগের এই আচরণের ফলেই কংগ্রেস শেষে তার পাকিস্তানের দাবিকে মেনে নেয়।

কংগ্রেসের লিগকে তুষ্ট রাখার নীতিও দেশভাগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। কংগ্রেস লিগের সামনে সর্বদাই এক ধরনের কুণ্ঠিত মনোভাব প্রদর্শন করত। এই ধরনের মনোভাবকে কংগ্রেসের দুর্বলতা বলেই মনে করা হত। উচ্চ আদর্শবাদ প্রচার করে ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকে এক মূলনীতি হিসাবে স্বীকার করে কংগ্রেস কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে ও লিগের সঙ্গে কূটনৈতিক ভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে শু(করে। কংগ্রেস বহু ে(ত্রে লিগের বহু অযৌক্তি(ক দাবি মেনে নেয়। লিগের সঙ্গে ''লক্নৌ চুক্তি('' কংগ্রেসের এক শোচনীয় ভুল, যা মুসলিমদের উৎসাহ যোগায়। ১৯৩২ সালে 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' ঘোষণার পর কংগ্রেস আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, যা প্রমাণ করে যে হিন্দু ঐক্য নিয়ে তার আত্মবিশ্বাস তেমন জোরালো ছিল না। এর ফলে লিগ স্বভাবতই উপকৃত হয়। নিজের নীতির সঙ্গে আপস করেও কংগ্রেস বহুবার লিগের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করে। কংগ্রেসের নেতারা, এমনকী গান্ধিও প্রায়শই জিন্নার সঙ্গে দেখা করলে জিন্নার মনোবল বেড়ে ওঠে এবং তিনি আচরণে উদ্ধত হয়ে পড়েন। জাতীয় সংহতির স্বার্থে কংগ্রেস হিন্দুদের আত্মত্যাগ করতে আবেদন জানালেও মুসলিমদের সম্পর্কে নীরব থাকে। ধর্মোন্মাদ

এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে অবশ্য যুক্তি(সঙ্গত আচরণ আশা করা অসম্ভব ছিল বললে ভুল হয় না। তাদের তোষণ করার নীতি ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু কংগ্রেস এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে লিগের সঙ্গে কোনও মীমাংসায় পৌঁছোন দূরে থাক, কংগ্রেস মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকেই উৎসাহ দেয়। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রতিত্রি(য়ায় আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। কংগ্রেসের সব থেকে বড় ব্যর্থতা এই যে সে এমন কোনও আদর্শ বা অভিন্ন ল(্য উপস্থাপিত করতে পারেনি, যা হিন্দু ও মুসলিম, উভয় সম্প্রদায়কেই আকর্ষণ করবে এবং তারা ধর্মীয় প্রভেদ ভুলে এক সঙ্গে কাজ করবে। ধর্মীয় প্রভেদ দূর করার চেষ্টা করতে গিয়ে কংগ্রেস বরং তা বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও, জিন্না একটি প্র(তোলেন ঃ স্বাধীনতার পর মুসলিমদের অবস্থান কী হবে? কংগ্রেস এই প্র(ের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।' জিন্না নিজেই এই প্র(ের উত্তর দেন, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জিন্না বলেন, ''মুসলিমরা হিন্দুদের ত্র(ীতদাসে পরিণত হবে।'' স্বভাবতই পাকিস্তানের দাবি মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কংগ্রেস ভারতবাসীদের এ কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে, স্বাধীনতার পর সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে এক ধর্মানিরপে(ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ যে ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আশ্রয় নিয়েছিল, তার সাফল্য ছিল অবধারিত।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুসলিম লিগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি(সেন্ট্রাল কক্সিউটিভ দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীতে পরিণত করে, যার ফলে তা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এই ঘটনাকে দেশভাগের আর একটি কারণ বলা যেতে পারে। মুসলিম লিগের 'প্রত্য(আন্দোলন', ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাবার ঘোষণা ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেশভাগের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন জহরলাল নেহ(বলেন, ''দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে হিংসা দেখা দিয়েছে তা কলঙ্কজনক— এই হিংসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।'' সর্দার প্যাটেলও বলেন, ''আমার মনে হয়েছিল যে দেশভাগ মেনে না নিলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।'' মার্কিন সরকার ভারতের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানায়। দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের পর ব্রিটেন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভারত ও তার কাছে আর অর্থনৈতিকভাবে সেরকম লাভজনক থাকে না। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিবাদ ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেয় যে তারা আর ভারতীয় সেনাদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। এই সব ঘটনা ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে এবং যেহেতু লিগ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় থাকে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক ভয়াবহ রক্ত((য়ী চেহারা নেয়—স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৪.৫ দেশভাগ ও ইতিহাসবিদরা

ভারত ভাগ নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ব্রিটিশ, ভারতীয় ও পাকিস্তানি পণ্ডিত, আমলা, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদরা সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব এবং দেশভাগ সম্পর্কে যা যা মত দিয়েছেন তার এক সং(প্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

সি.এইচ. ফিলিপস ও এম.ডি. ওয়েনরাইটের ''The Partition of India : Policies and Perspectives' গ্রন্থে সংযুক্ত(প্রদেশে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের জয়লাভে মুসলিম প্রতিত্রি(য়া ও ১৯৪০-এর সাম্প্রদায়িক পরিবেশের চিত্রাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়।

এ. কে. গুপ্ত সম্পাদিত 'Myth and Reality : The Struggle for Freedom in India 1945-47'

গ্রন্থে দেশভাগের যন্ত্রণা সম্পর্কে খ্যাতনামা হিন্দী, বাংলা ও পাঞ্জাবি লেখকদের প্রতিত্রি(য়াকে বি(েষণ করা হয়।

বিপান চন্দ্র তাঁর 'Communalism in Modern India' গ্রন্থে দাবি করেন যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি প্রকৃত দ্বন্দ্ব ছিল না—বরং তা গড়ে উঠেছিল প্রকৃত দ্বন্দ্বের এক বিকৃত প্রতিফলনের ভিত্তির উপর। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক বাস্তবের কোনও সাধারণ ধারণা ছিল না, তা ছিল এক ''বিকৃত বা অসত্য চেতনা।'' মুসলিম 'নেশনহুড' বা 'মহাজাতিত্ত্বের বিবর্তনের প্রে(াপটের পরিচয় পাওয়া যায় ডব্লু সি স্মিথ, আজিজ আহমেদ মহম্মদ মুজিব, আই এইচ কুরেশি, খালিবদিন সফিদ, হাফিজ মালিক, সৈয়দ রাজা ওয়াস্তি ও কে. কে. আজিজের রচনাগুলিতে যেগুলিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রতি সমর্থনের আভাস মেলে।

বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে শিব রাও, দুর্গা দাস, খুশবন্ত সিং জে. এন. সাহনি, এম. এস. এম. শর্মা ও কে. রামা রাওয়ের রচনাগুলিও যথেষ্ট বি(েস্ত।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে দেশভাগ নিয়ে বহু প্রকাশনার জন্ম হয় যেগুলি উপমহাদেশের প(ে যথেষ্ট তাৎপর্যময় প্রমাণিত হয়। বি. আর. আম্বেদকার রচনা করেন 'Pakistan an the Partition of India'। বেণী প্রসাদের 'Hindu-Muslim Question'. হুমায়ন কবীরের 'Muslim Politics', রাজেন্দ্র প্রসাদের India divided' এবং সৈয়দ তুফেইল আহমেদ মাঙ্গালোরির Mussalman Ka Ranshan Must a Quil' রচনাগুলি কংগ্রেসের দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে। অশোক মেহতা ও অচ্যুত পটবর্ধনের 'The Communal Triangle in India' এবং শাউকতুল্লা আনসারির 'Pakistan-The Problem of India' গ্রন্থগুলি থেকে সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

এফ. কে. কে. চুরাশির 'The Meaning of Pakistan', মহম্মদ নোমানের 'Muslim India—Rise and growth of the All India Muslim League' ও কাজী মহম্মদ ইশার 'It shall Never Happen Again গ্রন্থগুলিতে মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। সাভারকার ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং এইচ. ভি. শেষাদ্রির 'The Tragic story of Pakistan' রচনাগুলি উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

হিউজ টিঙ্কার পেন্ডারেল মুন, নিকোলাস ম্যানসারজ, ই ডব্লু আর লাম্বি, এইচ ভি. হডসন, ইয়ান স্টিফেনস ও লিওলার্ড মোসলের মত ব্রিটিশ পণ্ডিত ও সাংবাদিকরা দেশভাগের আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক ধ্বংসলীলার বিবরণ দেন। ম্যানসারজ ও লাম্বি বিশেষ করে দেশভাগের পিছনে সরকারি নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মহাত্মা গান্ধির রচনাসমগ্র ও জহরলাল নেহ(র নির্বাচিত রচনাবলী সাম্প্রদায়িক বিতর্কগুলি সবার সামনে উন্মোচিত করে দেয় এবং এক অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণার উপর মুসলিম লিগের মতাদর্শগত আত্র(মণ সম্পর্কে তাঁদের প্রতিত্রি(য়া সম্পর্কে আমাদের মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। রাজেন্দ্র প্রসাদ ও বল্লবভাই প্যাটেলের রচনাগুলিও এ(ে ত্রে যথেষ্ট মূল্যবান।

আর. জে. মুর, অনিতা ইন্দর হিং, আয়েশা জালাল, ফরজানা শেখ ও পল ব্রাসের রচনাও দেশভাগ সংত্র(ান্ত আলোচনাতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

পাকিস্তানের দাবি ও ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের দুঃস্বপ্নের সময়ের জন্য কারা দায়ী, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধানের অঙ্গ হিসাবে কংগ্রেস-লিগ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ বিস্তারিত আলোচনা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এমন এন. দাসের Partition and Independence of India : Inside story of the Mountbatten Days, এইচ. এম. সিবভাইয়ের Partition of India : Legend and Reality, দীপক

পান্ডের Congress Muslim League Relations, ডি. এ. লো সম্পাদিত Congress and the Raj : Facts of the Indian Struggle, 1917-47 ; ও স্ট্যানলে উলপার্টের Congress and the Indian Nationalism.।

ডেভিদ গিলমার্টিন, ইয়ান ট্যালবট, প্রেম চৌধুরী ও মারা এফ ডি আনসারি ব্রিটিশ ভারতের মূল কেন্দ্রগুলি থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেন। উপমহাদেশের বেশির ভাগ মুসলিমই বাংলাতে বাস করতেন। এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলি ছিল প্রকাশ্য এবং এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম, উভয় সম্প্রদায় থেকেই বেশ কিছু রচনা উঠে এসেছিল। ক্রমফিল্ড, সুমিত সরকার, রজত কান্ত রায়, কেনেথ ম্যাকফারসন, তনিকা সরকার, সুগত বোস, পার্থ চ্যাটার্জী, অমলেন্দু দে ও জয়া চ্যাটার্জি সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিদগ্ধ রচনার মাধ্যমে দেশভাগের উৎস অনুসন্ধান করেছেন। সুরঞ্জন দাসও বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাগুলির এক সার্বিক, বিন্যস্ত বি(-ষণ উপস্থাপিত করেছেন।

সংযুক্ত(প্রদেশকে সাধারণত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রাণকেন্দ্র ও দেশভাগের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হয়। পল ব্রাস এই প্রদেশের এক সার্বিক বি(-ষণ পেশ করেছেন। যাঁরা গান্ধির কার্যকলাপ ও ১৯৪০-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা জি. ডি. বিড়লার In the shadow of the Mahatma গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। অন্যান্য ব্যক্তি(গত স্মৃতিচারণের মধ্যে আছে এন. কে. বোসের My Days with Gandhi সুধীর ঘোষের Gandhi's Emissary। এছাড়া নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর (Autobiography of an Unknown Indian গ্রন্থে তাঁর গভীর মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন ল(করা যায়। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে আছে জি.ডি. খোসলার 'Memory's Gay Chariot' ও 'Stern Rekoning' কে. এ. আব্বাসের 'I an not an Island' ও এম. সি. চাগলার 'Roses in December'।

মুসলিম সংগঠনগুলির সঙ্গে জড়িত গু(ত্বপূর্ণ স্মৃতিচারণা, আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চৌধুরী খালিজুজামানের 'Pathway to Pakistan' আগা খানের স্মরণালেখ্য, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানির 'Quaid-e-Azom as In know Him'. ফিরোজ খান নুনের 'From Memory', চৌধুরী মহম্মদ আলির 'The Emergence of Pakistan', সৈয়দ সামসুল হাসিমের 'From My Jinnah', এবং ওয়ালি খানের 'Facts are Facts : The untold story of Indian's Partition'।

ব্রিটিশ প্রশাসকদের উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচারণের মধ্যে আছে ফ্রান্সিস টাকারের 'While Memory somes', অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের 'Mission with Mountbatten', কনরাড কনিফিল্ডের 'The Princely India I knew' ও পেন্ডেরেল মুনের 'Wavell : The Viceroy's Journal'।

মুসি(ল হাসানের মতে, দেশভাগের ইতিহাসের সঙ্গে প্রায়শই কিছু আপাত-স্ববিরোধী ঘটনা জড়িয়ে আছে ঃ ১৯৪০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত যাদের প্রতি কোনও সামাজিক সমর্থন ছিল না। সেই মুসলিম লিগ এমন এক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল যার ফলে ভারত ভেঙে টুকরো হল (জিন্না পাকিস্তানের দাবির মুখ্য প্রবক্ত(ায় পরিণত হলেন এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামরত কংগ্রেস অশোভন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দেশভাগের পরিকল্পনাকে স্বীকার করে নিল।

দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুযায়ী, দেশভাগ হল হিন্দু ও মুসলিমদের মিটমাটের অসাধ্য পারস্পরিক বিরোধিতার অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণাম। জাতীয়তাবাদীদের মতে দেশভাগ আগেই কোনও স্বাভাবিক পরিণতি নয় সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(র ষড়যন্ত্রই দুটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ। ১৯৪০ সালে লাহোরে লিগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, জাতীয়তাবাদীরা তাকেই এক সন্ধি(ণ হিসাবে চিহ্নি(ত করেন। ওই প্রস্তাবেই প্রথম সার্বভৌম ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপর লিগ ও জিন্না দেশভাগের জন্য অবিরাম চাপ সৃষ্টি করতে শু(করেন।

সাম্প্রতিক কালে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় স্তর থেকে প্রাদেশিক পর্যায়ে সরে গেছে, যা আবার নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহেরও এক প্রতিফলন বলা যেতে পারে। ১৯৪০-এর ঘটনাবলী ও বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসের নির্দিষ্ট সম্পর্কের পরিপ্রে(তে সত্তা গঠন ও সামাজিক চলনশীলতাই চিন্তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্য এক স্তরে দেশভাগের রাজনীতিরও পুনর্বিবেচনা করা হয়। সংশোধনবাদী চিন্তার একটি ধারা লাহোর প্রস্তাবে নিহিত ভারতীয় রাজ্যগুলির এক যুক্ত(রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনে ব্যর্থতা ও তার ফলে দেশভাগের কারণ অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের রাজনীতির বাধ্যবাধকতা ও স্ববিরোধগুলির উপর মনোনিবেশ করে।

মুসি(ল হাসান দেশভাগ নিয়ে রচিত বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি ঘটনাবলীর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নি(ত করেছেন, সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সমান্তরাল ইতিহাসকে বি(ে-ষণ করেছেন যাতে দেশভাগের সময়ে মানুষের ভয়, দুর্দশা, হারানোর যন্ত্রণা ইত্যাদিকে আবার অনুভব করা যায়।

দেশভাগের বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের গবেষকদেরও যথেষ্ট ভাবে আকর্ষণ করছে। এম. সেত্তার ও ইন্দিরা বি. গুপ্ত সম্পাদিত 'Pangs of Partition' গ্রন্থের দুই খণ্ড দেশভাগের অনিবার্যতা ও বিভিন্ন আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিত কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে।

'The Imperialist Distribution of the Partition of India : A Historigraphical Critique of the Writings of Percival spear and H V Hodson গ্রন্থে বি. এন. পান্ডে সাফল্যের সঙ্গে দেশভাগের কারণগুলির সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন। স্পিয়ার ও হডসনের রচনাতে দেশভাগের পিছনে ব্রিটিশদের ভূমিকাকে ধামাচাপা দিতে হিন্দু ও মুসলিমদের দীর্ঘ দিনের মতভেদকেই বড় করে দেখানো হয়। এই দুই লেখকই ব্রিটিশ শসাক শ্রেণির সদস্য ছিলেন, এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের দায়িত্ব ছিল ভারতবাসীকে শি(িত করে তোলার অছিলায় ইংরাজ শাসনকে সমর্থন যোগানো। পান্ডে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দেশভাগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদদের তৈরী করা এই সব কল্পবাহিনীকে নস্যাৎ করে দিতে সমর্থ হন।

খাজা ও খালিকের মত বিশেষজ্ঞরা অবশ্য 'দ্বি-জাতি তত্ত্বকে' দেশভাগের জন্য দায়ী করেছেন। 'Genesis of Partition' শীর্ষক রচনায় তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের চিরকালীন সাংস্কৃতিক বিভাজনের তত্ত্বকে অনুমোদন করেন। ভারতে মুসলিমদের পদার্পণ করার সময় থেকে তিনি এই বিভাজন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। দুই সম্প্রদায়ই ধর্মকে অত্যন্ত গু(ত্ব দেওয়ায় তারা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। মুসলিমদের বি(ৈজনীন পরিচয় ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয়তাবাদে দী(িত হবার পথে এক বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বিবাদ লেগেই থাকত। সালের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশরা হিন্দুদের প্রতি প(পাতপূর্ণ মনোভাব দেখালে এই দুই সম্প্রদায়ের মতো ব্যবধান আরও বেড়ে ওঠে। আলিগড় আন্দোলনের সূচনা ও মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হলে অবশ্য মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এক স্বল্প মেয়াদি ঐক্য সৃষ্টি করলেও চিরস্থায়ী কোনও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি। সরকার গঠন করার সময় অবশ্য হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে এক নতুন মোড় নেয়। ছটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন (মতা অর্জন করলে মুসলিমদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার ধারণার জন্ম হয় এবং তারা মনে করতে থাকে যে একমাত্র পৃথক কোনও মুসলিম বাসভূমিকেই তাদের স্বার্থ সুরি(ত থাকা সম্ভব।

সলিল মিশ্র ১৯৩৭ সালে সংযুক্ত(প্রদেশের রাজনীতিকে ঘিরে যে সব ঘটনা ঘটে, তাদেরই দেশভাগের জন্য দায়ী মনে করেন। লিগ-কংগ্রেস জোট গঠন করা সম্ভব হলে দেশভাগ এড়ানো যেত কি না, এ বিষয়ে ইতিহাসবিদরা

দীর্ঘ দিন চিন্তা ভাবনা করে আসছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে জোট গঠনে ব্যর্থতাই দেশভাগের মূল কারণ এবং তাঁরা এই ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করেন। এর ফলেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা এক গুরুতর আকার ধারণ করে। সংযুক্ত প্রদেশে মুসলিম লিগ এককভাবে এক বিশাল গোষ্ঠী ছিল না এবং জিন্নার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। জিন্না এই ধরনের জোট গঠনে সম্মতি দিতেন যদি অন্যান্য প্রদেশেও জোট সরকার গঠন করা হত ও মুসলিম লিগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসবে স্বীকার করে নেওয়া হত। এই ধরনের জোটের কার্যকারিতা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। জোটের কার্যকারিতা ছিল এক কৌশলগত প্রশ্ন যা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত কংগ্রেসের উচ্চ সারির নেতাদের। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাদের অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারগুলি বিবেচনা করে দেখতে হত।

দেশভাগের পিছনে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা সম্পর্কে বি আর নন্দা ও চিত্তব্রত পালিতের দুটি নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য, সেগুলিতে গান্ধির দ্বিধা ও বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ''Tragedy and Trinaiph : The last Days of Mahatma Gandhi' শীর্ষক নিবন্ধে নন্দা ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার কথা চিন্তা করে গান্ধির অসহায়তার কথা বর্ণনা করেছেন। গান্ধি আহত হয়েছিলেন এই কথা ভেবে কংগ্রেসের নেতারা তাঁর পরামর্শকে অবাস্তব মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবুও অক্লান্তভাবে ভ্রমণ করে গান্ধি পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সাফল হয়েছিলেন। তাঁর 'Mahatma Gandhi and the Partition of India' রচনায় চিত্তব্রত পালিত গান্ধির সত্যাগ্রহের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরেন এবং দেখান দেশভাগের আগে তিনি কীভাবে এক হতাশাগ্রস্ত, একাকী মানুষে পরিণত হন।

দ্বিতীয় খণ্ডে স্মৃতিচারণ, সৃজনশীল রচনা, শিল্পকলা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রধনাত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা সংকলিত করা হয়েছে। এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে বহু বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীর অবদান যাদের মধ্যে আছেন সতীশ গুজরাল, মৃণাল পান্ডে, উর্বশী বুটালিয়া, কৃষ্ণ কুমার ও পার্থ চ্যাটার্জি।

এইভাবে ইতিহাসবিদরা সব রকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেশভাগ সম্পর্কে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করে সেই বিষয়ে রচিত সাহিত্য কর্মে নানা ধরনের নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

৪.৬ সূত্র নির্দেশ

১. Penderel Moon : Wavell : The Vicevoy's Journal, Oxford, 1978.

২. V P Menon : Transfer of Power, Bombay, 1956

৩. S. Settar, I. B. Gupta (ed.) : Pangs of Partition, Vol. I & II. New Delhi, 2002.

৪. Mushirul Hasan : India's Partition — Process strategy and Mobilization, New Delhi, 1998.

৫. Keka Dutta Rpy : Political Upsurges in Post War India, New Delhi, 1992.

৬. Jalal, Ayesha : The Sole Spokesman, Jinnah the Muslim League and the Demand for Pakistan, Cambridge, 1985.

৭. Chittabrata Palit and Ujjal Ray : Bengal before and after the Partition (1947) : The Changing Profile of a Province, Kolkata, 2004.

৮. Sumit Sarkar : Popular Movement and Middle Class Leadership in Late Colonial India-Perpectives and Problems of a History from Below, Calcutta, 1983.

৯. Bipan Chandra : India after Independence, New Delhi, 1999.

৪.৭ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১. **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১৯৪৭ সালে ভারতের বিভাজন কি অনিবার্য ছিল?

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

ক্যাবিনেট মিশনের মূল প্রস্তাবগুলি কী ছিল? এই প্রস্তাবগুলির প্রতি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী রকম ছিল?

৩. **অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ**

কে প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA) সংগঠিত করেন ও কখন?

৪.৮ সংক্ষিপ্তসার

বিদেশের সহায়তা নিয়ে সুভাষচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বলপ্রয়োগ করে ব্রিটিশকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করা। নেতাজির ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে গভীর এক ভীতির সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী (যেমন নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ইত্যাদি) ব্রিটিশদের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে এবং তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে ১৯৪৬ সালে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ভারতীয়দের হাতে (মতা হস্তান্তরের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করবে। কিন্তু ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতার সম্ভাবনার উপর কালো মেঘ হিসাবে দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অবিভক্ত ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে পদার্পণ করেন এবং ভারতীয়দের হাতে (মতা তুলে দেবার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই তাঁর পরিকল্পনা মেনে নিলে ভারতীয়দের হাতে (মতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি শুরু হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে, কিন্তু তার ভূমিখণ্ড থেকে পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি করা হয়।

ইতিহাস

(স্নাতকোত্তর পাঠত্র(ম)

তৃতীয় পত্র — পর্যায়-৪